ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

‘অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা। তবে তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও’ (বাক্বারাহ ২/১৫৫)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৯তম বর্ষ ১১ম সংখ্যা
আগস্ট ২০২৬

বাংলাদেশের বন্যায় সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির চিত্র

(১৯৭৪-২০২৬)

১৫.৯ কোটি+
মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

৬,০০০+
মানুষের মৃত্যু

৩০ লাখ+ হেক্টর
কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত

হাযার হাযার কোটি
টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি

বাংলাদেশের বন্যা :
বাস্তবতা ও করণীয়

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية

المجلد : ٢٩ العدد : ١١ صفر و ربيع الأول ١٤٤٨هـ/أغسطس ٢٠٢٦

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

কর্মী সম্মেলন ২০২৬

তারিখ
২৭ ও ২৮
আগস্ট, বৃহস্পতি ও শুক্রবার

LIVE
Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

ভাষণ দিবেন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা নেতৃবৃন্দ এবং বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন সকাল-৯টা

সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩

ISSN : 3105-4137
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
মাসিক
আত-তাহরীক
رেজি: নং রাজ ১৬৪

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

ছফর-রবীঃ আউয়াল ১৪৪৮ হি.
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩৩ বাং
আগস্ট ২০২৬ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
একাউন্ট নং : Masik At-Tahreek, 00712200 00115, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮ *(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা : সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি ও আমাদের প্রত্যাশা ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - আযান ও ইক্বামতের গুরুত্ব ও ফযীলত *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ০৩
  - ফজর ছালাত : গুরুত্ব ও ফযীলত *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ০৭
  - মার্কসের দর্শন বনাম ইসলাম : ভ্রান্ত তত্ত্ব বনাম শাশ্বত সত্য *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ১৩
  - আহলে বায়ত : পরিচয় ও মর্যাদা *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ২০
- **প্রচ্ছদ রচনা :**
  - বাংলাদেশের বন্যা : বাস্তবতা ও করণীয় *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২৭
- **সময়ের ভাবনা :**
  - বিশ্বকাপের মোহে বেহুঁশ তারুণ্য : একটি আত্মজিজ্ঞাসা *-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* ২৯
- **ছাহাবী চরিত :**
  - ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ৩০
- **নবীনদের পাতা :**
  - স্মার্টফোন আসক্তি : সময় ও মেধার নীরব ঘাতক *-হাসীবুর রশীদ* ৩৩
- **সন্তান পরিচর্যা :**
  - সন্তান আমার আয়না *-জাহিদ হাসান* ৩৭
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - এডুকেশন বিজনেস *-সারওয়ার মিছবাহ* ৪০
- **ইতিহাসের পাতা থেকে :**
  - ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর দৃঢ়তা *-ড. নূরুল ইসলাম* ৪৩
- **কবিতা :** ৪৪
  - ক্ষণিকের মুসাফির
  - ইনশিরাহ-এর ভাবানুবাদ
  - একটি সফরের বিদায়
  - এসো কলম ধরি
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৫
- **মুসলিম জাহান** ৪৫
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা : সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি ও আমাদের প্রত্যাশা

গত ৭ই জুলাই মঙ্গলবার মানিকগঞ্জের সিংগাইরে সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন মহড়া এলাকায় পূর্বঘোষণা ছাড়াই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আকস্মিকভাবে উপস্থিত হন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোন প্রধানমন্ত্রী মাঠপর্যায়ের সেনা সদস্যদের সঙ্গে এতটা দীর্ঘ সময় কাটালেন। বাংকারে নেমে তাদের সঙ্গে খাবার খেলেন, রণকৌশল নিয়ে কথা বললেন। একইভাবে ১৩ই জুলাই সোমবার বরিশালের বাবুগঞ্জেও তিনি অপর এক প্রশিক্ষণ মহড়া পরিদর্শন করেন। এর আগে ১৮ই জুন বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীতে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান উদ্বোধন করেন '২য় বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন', যার চারটি কোম্পানীর নামকরণ হয়েছে ইসলামের মহান চার খলীফা আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর নামে। একই সময়ে সেনাপ্রধান নিজে দাড়ি রেখেছেন ও সেনা সদস্যদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে চীন ও পাকিস্তানের সাথে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ যেন এক নতুন বাংলাদেশের ইঙ্গিত, যে বাংলাদেশ তার সেনাবাহিনীর মাধ্যমে নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের উক্ত পদক্ষেপ সমূহকে স্বাগত জানাই। সেই সাথে ট্রেইনিংকালে সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে হাফপ্যান্টের বদলে টাখনুর উপর পর্যন্ত ফুলপ্যান্ট পরিধান করা, সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা, সুন্নাতী দাড়ি রাখা প্রভৃতি ধর্মীয় বিধি বাস্তবায়নের দিকে নযর দেয়ার আহ্বান জানাই।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকারের ১৩তম জাতীয় সংসদ অধিবেশন শুরুর আগের দিন ১১ই মার্চ বুধবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে স্পীকারের মাথার উপরে কালেমা শাহাদাতের ক্যালিগ্রাফি স্থাপন করাসহ একটি কল্যাণ রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য তাঁর কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ আমাদের আশান্বিত করেছে। ঠিক একইভাবে তাঁর পিতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল সংবিধানের শুরুতে (প্রস্তাবনার ঠিক ওপরে) 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' সংযোজন করেছিলেন। অতঃপর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম 'ধর্মনিরপেক্ষতা' পরিবর্তন করে সেখানে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করেন। যদিও শেখ হাসিনার আমলে ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনীতে তা পুনরায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। ২০২৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই মূলনীতি পুনঃস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা সেটির আশু বাস্তবায়ন কামনা করি।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, '২য় বাংলাদেশ ব্যাটালিয়নে'র চারটি কোম্পানীর নামকরণ ইসলামের মহান চার খলীফার নামে করায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলোর গাত্রদাহ তুঙ্গে উঠেছে। যদিও সেদেশের মোট জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১৫.২ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের ২৯ শতাংশ এবং আসামের ৩৬ শতাংশ জনসংখ্যা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের সর্বত্র হিন্দুত্ববাদের জয়জয়কার। সে দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামসহ পূর্বাঞ্চলীয় কম্যাণ্ড প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভি. এম. বি. কৃষ্ণন, সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ প্রধান প্রবীণ কুমার সবাই অমুসলিম। তাদের সেনাবাহিনীর গঠন ও ঐতিহ্যে হিন্দু দেবদেবীদের অত্যন্ত শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে। যেমন যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের উদ্দীপিত করতে তারা তাদের হিন্দু দেবদেবীদের নাম উচ্চারণ করে থাকেন। যেমন (১) বিহার রেজিমেন্ট 'জয় বজরং বলী' (ভগবান হনুমানের নামে), (২) দিল্লী সদরের রাজপুতানা রাইফেল্স 'রাজা রামচন্দ্র কি জয়' (ভগবান রামের নামে), (৩) উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গড়ওয়াল রাইফেলস 'বদ্রী বিশাল লাল কি জয়' (ভগবান বিষ্ণুর বদ্রীনাথ রূপের উদ্দেশ্যে নিবেদিত), (৪) হিমাচল প্রদেশের ডোগরা রেজিমেন্ট 'জ্বালা মাতা কি জয়' (দেবী দুর্গার আরেক নাম 'জ্বালা মাতা' বা অগ্নিদেবী), (৫) জম্মু ও কাশ্মীর রাইফেলস 'দুর্গা মাতা কি জয়' (দেবী দুর্গার নামে), (৬) মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি 'হর হর মহাদেব' (ভগবান শিবের নামে)। অনুরূপভাবে শিখদের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীতে শিখ রেজিমেন্ট ও শিখ লাইট ইনফ্যান্ট্রি নামে সম্পূর্ণ আলাদা রেজিমেন্ট আছে। দাড়ি ও পাগড়ি তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ এ নিয়ে কারো কোন আপত্তি দেখা যায় না। গেরুয়া গামছা গায়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পাগড়ি ও শ্মশ্রুমণ্ডিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর ব্যাপারে তাদের কোন কথা নেই।

অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের পৃথক কোন রণধ্বনি নেই। কিংবা ভারতের স্বতন্ত্র কোন রণধ্বনি নেই। বরং সামগ্রিকভাবে সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জাতীয় পর্যায়ে যে রণধ্বনি ও শ্লোগানগুলোকে সার্বজনীন বা জাতীয় স্তরের রণধ্বনি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হ'ল 'ভারত মাতা কি জয়', 'জয় হিন্দ' ও 'বন্দে মাতরম'। কিন্তু এতেও তাদের কোন সমস্যা হয় না, যদিও সেদেশের ঘোষিত মূলনীতি হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ!

মূলত প্রতিবেশী দেশের মিডিয়া যখন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে ইসলামের চার খলীফার নাম দেখে 'ইসলামীকরণ' বলে আতংকিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সমস্যাটা নীতির নয়, বরং বাংলাদেশের নিজস্ব ধর্মীয় সত্তার উপর দাঁড়ানোর চেষ্টা দেখেই তাদের এই অস্বস্তি। বাংলাদেশ শতকরা একানব্বই ভাগের অধিক মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। এই দেশের সেনাবাহিনী তার সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটাবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা কাফেরদের মোকাবিলায় সাধ্যমত শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো, যা দিয়ে তোমরা ভীত করবে আল্লাহ্র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের এবং অন্যদের যাদেরকে তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ তাদের জানেন' *(আনফাল ৬০)*। এই শক্তি কেবল অস্ত্রের শক্তি নয়, বরং ঈমানী শক্তিই হ'ল মূল। যেমন আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরীদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে' *(তওবা ১১১)*। তাই মুসলিম সেনাবাহিনী কেবলমাত্র জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে হাসিমুখে জীবন দেয়। সীমান্ত প্রহরা দেয়। তারা আল্লাহ্র নামে তাকবীর ধ্বনি করে। কোন দেব-দেবীর নামে নয়। যেখানে পূজারী ও পূজ্য দু'টিই ব্যর্থ *(হজ্জ ৭৩)*। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের অন্তরে যদি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ত নির্ভরতা থাকে, তবে সেই সেনাবাহিনী কেবল সীমান্ত নয়, বরং দেশের জাতীয় মর্যাদাকে অটুট রাখবে ইনশাআল্লাহ।

[বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

আযান ও ইক্বামতের গুরুত্ব ও ফযীলত

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

আযান ইসলামের অন্যতম নিদর্শন এবং মহান আল্লাহ্র একত্ব ও বড়ত্বের সুমধুর ঘোষণা। প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসা এই সুললিত ধ্বনি মুমিনের হৃদয়ে ঈমানের জোয়ার বয়ে আনে এবং আত্মাকে নির্মোহ আনন্দে সিক্ত করে। এটি মানুষকে শাশ্বত কল্যাণ ও চিরন্তন সফলতার দিকে নিরন্তর আহ্বান জানায়। আযান ও ইক্বামত মহান আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর যে ব্যক্তি আযানের জবাব দেয় সেও আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন । মুয়ায্যিনের কণ্ঠস্বর যতদূর পৌঁছায়, ক্বিয়ামতের দিন জিন-ইনসানসহ সব সৃষ্টি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। মুসলিম সমাজে সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আযানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে আযানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ফযীলত ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

আযানের পরিচয় :

'আযান' (الأذان) শব্দটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ব্যবহৃত একটি আরবী শব্দ। 'আযান'-এর আভিধানিক অর্থ- ঘোষণা করা, অবহিত করা, ছালাতের আহ্বান জানানো'।[১] পারিভাষিক অর্থে শরী'আত নির্ধারিত আরবী বাক্যসমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে ছালাতের আহ্বান করাকে আযান বলা হয়'।[২]

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) আযানের সংজ্ঞায় বলেন, فَهُوَ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ، بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، لِلْإِعْلَامِ بِهِ ' আযান হচ্ছে- ছালাতের সময় শুরু হওয়ার পর তা জানানোর জন্য নির্দিষ্ট যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করা'।[৩]

আযানের সূচনা ও ইতিহাস :

হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মাণের মাধ্যমে প্রথম হিজরীতে আযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।[৪] নাফে' (রহ.) হ'তে বর্ণিত, ইবনু ওমর (রা.) বলতেন, মুসলিমানরা যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা ছালাতের সময় অনুমান করে সমবেত হ'তেন। এর জন্য কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল না। একদা তাঁরা এ বিষয়ে বৈঠকে বসেন। কয়েকজন ছাহাবী মত দিলেন, নাছারাদের ন্যায় ঘণ্টা বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আবার কয়েকজন বললেন, ইহুদীদের মতো শিঙা ফুঁকানোর ব্যবস্থা করা হোক।[৫] কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিনের বৈঠক স্থগিত হয়ে যায়। পরদিন সকালে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দে রাব্বিহী (রা.) এসে রাসূল (ছা.)-কে স্বপ্নে দেখা বর্তমান আযানের শব্দগুলো শোনান। রাসূল (ছাঃ) তা সত্যায়ন করেন এবং উচ্চকণ্ঠের অধিকারী হওয়ার কারণে বেলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। আযানের সুমধুর ধ্বনি শুনে ওমর (রা.) চাদর ঘেষতে ঘেষতে দৌড়ে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমিও একই স্বপ্ন দেখেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা'।[৬] অন্য একটি বর্ণনা মতে, একই রাতে মোট ১১ জন ছাহাবী আযানের এই বাক্যগুলো স্বপ্নে দেখেছিলেন।[৭]

আযানের গুরুত্ব ও ফযীলত :

ইসলামে আযান একটি ফযীলতপূর্ণ আমল, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা যায়। এর মাধ্যমে দৈনিক পাঁচবার যেমন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তেমনি তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণাও দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা আযানের অনেক গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হ'ল।-

১. আযান মুসলিম উম্মাহ্র স্বতন্ত্র নিদর্শন :

অন্য উম্মতের ওপর ছালাতের বিধান থাকলেও আযানের বিধান ছিল কি-না তা জানা যায় না। বরং আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে ছালাত ফরয করার সাথে সাথে ছালাতের সময় জানানোর জন্য আযানের বিধান প্রবর্তন করেছেন। আযান প্রবর্তনের পর মদীনাতে যখন ছালাতের আযান দেওয়া হ'ত, তখন সেখানকার অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، 'আর যখন তোমরা ছালাতের জন্য (আযানের মাধ্যমে) আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলাচ্ছলে গ্রহণ করে। কারণ ওরা একেবারেই নির্বোধ সম্প্রদায়' *(মায়েদা ৫/৫৮)*। বিদ্বানগণ বলেন, হিজরতের আগে মক্কায় আযান ছিল না; বরং তারা ছালাতের জন্য 'আছ-ছালাতু জামে'আহ' বলে আহ্বান করত। হিজরতের পর এবং কা'বার দিকে ক্বিবলা পরিবর্তনের পর আযানের বিধান চালু হয়।[৮]

২. ছালাতের জন্য সুমধুর আহ্বান :

আযান মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহ ও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে শাশ্বত সাফল্যের দিকে ডাকে। এটি মূলত ইহকালীন ও

১. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৬২।
২. মির'আত ২/৩৪৪-৩৪৫, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'আযান' অনুচ্ছেদ-৪। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ২০১১ ইং, পৃ.৭০।
৩. শারহুল মুমতে 'আলা যাদিল মুসতাক্বনি (সঊদী আরব : দার ইবনে জাওযী, ১ম প্রকাশ ১৪২২ হি.) ২/৪০।
৪. মির'আত ২/৩৪৪-৩৪৫, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'আযান' অনুচ্ছেদ-৪।
৫. বুখারী হা/৬০৪; মুসলিম হা/৩৭৭; আহমাদ ৬৩৬৫।
৬. আবূদাঊদ হা/৪৯৯, সনদ হাসান ছহীহ; মিশকাত হা/৬৫০।
৭. মিরক্বাত শরহ মিশকাত 'আযান' অনুচ্ছেদ ২/১৪৯ পৃঃ। গৃহীত : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ১ম প্রকাশ, ২য় সংস্করণ নভেম্বর ২০১৫; ২৬১-২৬২ পৃ.।
৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, সূরা মায়েদাহ, ৫৮ নং আয়াতে তাফসীর দ্র.; পৃষ্ঠা ৪৩১।

পরকালীন কল্যাণের জন্য মুমিনকে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যম। মুয়াযযিনের সুমধুর কণ্ঠের আযানের ধ্বনি মুসলমানদেরকে তাদের উপর অর্পিত ফরয ছালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং স্বীয় রবের দরবারে হাযির হ'তে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ ছালাতের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، 'হে মুমিনগণ! যখন জুমু'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করো' *(জুমু'আ ৬২/৯)*।

আযানের এই সুমধুর সুর ও এর গভীর আবেদন মুমিনের অন্তরে এক বিশেষ শিহরণ জাগিয়ে তোলে। কবি কায়কোবাদ তাঁর 'আযান' কবিতায় এই সুরের আবেদনকে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে-

'কে ঐ শোনালো মোরে আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী
কে ঐ শোনালো মোরে আযানের ধ্বনি।'

৩. আযান সবচেয়ে উত্তম কথা :

পৃথিবীতে মানুষ যত ভালো কথা বলে থাকে তার মধ্যে আযান অন্যতম। এতে রয়েছে আল্লাহ্র বড়ত্ব, তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণা এবং সর্বোপরি ইসলামের শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতের দিকে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে ডাকা। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে, নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*।

উল্লেখ্য, ছালাতের আহ্বানের জন্য শুধু আযানই যথেষ্ট। আযান ব্যতীত মুওয়াযযিন আযানের আগে 'আঊযুবিল্লাহ', 'বিসমিল্লাহ', কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, ইসলামী জাগরণী, বিভিন্ন দো'আ অথবা 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান্নাঊম' বলা সুন্নাহ বিরোধী কাজ। এছাড়াও রামাযান মাসে সাহারীর সময় আযান না দিয়ে সাইরেন বাজানো, ডাকাডাকি করা, ঢাক-ঢোল পেটানো, দলবদ্ধভাবে চিৎকার করা ইত্যাদি জাহেলী রীতি।[৯]

৪. আযানের শব্দ শুনলে শয়তান ছুটে পালিয়ে যায় :

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু *(বাক্বারাহ ২/১৬৮, ২০৮)*। সে সর্বদা মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চায়। এমনকি মানুষের রক্তের মধ্যে মিশেও মানুষের শরীরে চলাফেরা করে।[১০] আর যখনই মুওয়াযযিন আযান শুরু করে তখনই সে ছুটে পালাতে শুরু করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، 'যখন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন ছালাতের জন্য ইক্বামত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়।[১১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ، 'শয়তান যখন ছালাতের আহ্বান (আযান) শুনে, তখন 'রাওহা' নামক স্থান পর্যন্ত পলায়ন করে'। বর্ণনাকারী (জাবের রাঃ) বলেন, 'রাওহা' হ'ল মদীনা হ'তে ৩৬ মাইল দূরে একটি স্থানের নাম'।[১২]

৫. আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া ও দো'আ কবুল :

প্রত্যেক আকাশের দরজা রয়েছে এবং বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন সময়ে আকাশের দরজাসমূহ খোলা হয়। আর প্রতিদিন আযানের সময় আকাশের দরজা খোলা হয়। আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إذا نُودِيَ بالصَّلاةِ فُتِحَت أبوابُ السَّماءِ، واستُجيبَ الدُّعاءُ، 'আযানের সময় আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবুল হয়'।[১৩]

৬. আযানের বরকতে ফেরেশতাদের সাথে ছালাত :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ، 'যখন কোন ব্যক্তি নির্জন স্থানে থাকে এবং ছালাতের সময় নিকটবর্তী হয়, তাহ'লে সে ওযূ করবে; আর যদি পানি না পায়, তাহ'লে তায়াম্মুম করবে। যদি সে ইক্বামত দেয়, তাহ'লে তার সাথে থাকা দু'জন ফেরেশতা তার সাথে ছালাত আদায় করে। আর যদি সে আযান ও ইক্বামত উভয়টিই দেয়, তাহ'লে তার পিছনে আল্লাহ্র বিশাল বাহিনী (ফেরেশতামণ্ডলী) ছালাত আদায় করে, যাদেরকে সে দেখতে পায় না'।[১৪]

৭. ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষ্য প্রদান :

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান আনছারী মাযিনী (রহ.) হ'তে বর্ণিত, তাকে তার পিতা সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) তাঁকে বললেন, 'আমি দেখছি তুমি বকরী চরানো

৯. ফাৎহুল বারী, হা/৬২১-এর আলোচনা দ্রঃ।

১০. বুখারী হা/৩২৮১।
১১. বুখারী হা/৬০৮; মুসলিম হা/৩৮৯; আহমাদ হা/৯৯৩৮।
১২. মুসলিম ৩৮৭; আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৪১।
১৩. আহমাদ হা/১৪৭৩০; ছহীহাহ হা/৫৩১, ১৪১৩।
১৪. মুছান্নাফে আবদুর রাযযাক হা/১৯৫৫; ছহীহ আতগীব হা/২৪৯।

এবং বন-জঙ্গলকে ভালোবাস। তাই তুমি যখন বকরী নিয়ে থাক বা বন-জঙ্গলে থাক এবং ছালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ‘জিন, ইনসানসহ যেকোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুওয়ায্যিনের আওয়ায শুনবে, সে ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে’।[১৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ، وَلَا مَدَرٌ، وَلَا حَجَرٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ، ‘মুওয়ায্যিনের আযানের আওয়াজ গাছপালা, বন-জঙ্গল, জনপদ, পাহাড়, জিন এবং মানুষ যে শুনবে সে ক্বিয়ামতের দিন মুওয়ায্যিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে’।[১৬]

৮. আযানের জবাবে জান্নাত লাভ :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ،

‘তোমাদের কেউ যদি মুয়ায্যিনের ‘আল্লাহু আকবার’ ‘আল্লাহু আকবার’-এর জওয়াবে ‘আল্লাহু আকবার’ ‘আল্লাহু আকবার’ বলে এবং ‘আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর জওয়াবে ‘আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে এবং ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’-এর জওয়াবে ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলে। অতঃপর ‘হাইয়্যা আলাছ-ছালাহ’-এর জওয়াবে যদি ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলে। তারপর ‘হাইয়্যা ‘আলাল-ফালাহ’-এর জওয়াবে যদি ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলে। তারপর যদি ‘আল্লাহু আকবার’ ‘আল্লাহু আকবার’ জওয়াবে ‘আল্লাহু আকবার’ ‘আল্লাহু আকবার’ এবং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর জওয়াবে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে তাহ’লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[১৭]

১৫. *বুখারী হা/৬০৯; মুসলিম হা/৩৮৯; তিরমিযী হা/৩৯৭।*
১৬. *ইবনে খুযায়মাহ হা/৩৯; ইবনে মাজাহ হা/৭২৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৩২।*
১৭. *মুসলিম হা/৩৮৫।*

৯. সালাফদের আযান প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ :

ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রা.) বলতেন, لو كنتُ أُطيقُ الأذانَ مع الخِلِّيفا لأذَّنتُ، ‘যদি আমি খলীফার সাথে আযান দিতে পারতাম, তাহ’লে অবশ্যই তা করতাম’।[১৮]

রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেরা আযান না দেওয়ার কিছু কারণ রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম যিম্মাদার আর মুওয়াযযিন আমানতদার।[১৯] তাই রাসূল (ছাঃ) নিয়মিতভাবে আমানত আদায়ে সক্ষম এরূপ ব্যক্তির নিকটে আযান দেওয়ার আমানত অর্পণ করেছিলেন। আযানের মূল উদ্দেশ্য লোকদের কাছে ছালাতের আহ্বান পৌঁছানো। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বড় বড় ছাহাবীদের বাদ দিয়ে এমনকি যিনি আযানের শব্দগুলো স্বপ্নে দেখেছিলেন তাকেও বাদ দিয়ে উঁচু কণ্ঠস্বরের অধিকারী বেলাল (রাঃ)-কে আযানের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।[২০] উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ)-এর আযান দেওয়ার ব্যাপারে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। একবার সফরে তিনি আযান দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[২১]

ইক্বামতের গুরুত্ব ও ফযীলত :

‘ইক্বামত’ (الإقامة) অর্থ দাঁড় করানো। উপস্থিত মুছল্লীদেরকে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারী শুনানোর জন্য ‘ইক্বামত’ দিতে হয়। জামা‘আতে হউক বা একাকী হউক সকল অবস্থায় ফরয ছালাতে আযান ও এক্বামত দেওয়া সুন্নাত।[২২]

ইসলামী শরী‘আতে আযানের ন্যায় ইক্বামত প্রদান করাও অত্যন্ত ছওয়াব ও মর্যাদাপূর্ণ একটি আমল।[২৩] আযানের মাধ্যমে দূরবর্তী মুছল্লীদের মসজিদে আহ্বান করা হয়, আর আযানের পর মূল জামা‘আত শুরুর ঠিক প্রাক্কালে মসজিদে উপস্থিত মুছল্লীদের কাতারবদ্ধ হওয়া ও ছালাতের চূড়ান্ত প্রস্তুতির ঘোষণা হিসাবে ইক্বামত দেওয়া হয়। হাদীছে ইক্বামতের অনেক ফযীলত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হ’ল।-

১. ইক্বামতের সময় আকাশের দরজাসমূহ খোলা হয় :

আযানের সময় যেমন আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং দো‘আ কবুল হয় তেমনি যখন ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া হয় এবং ইমাম ও মুছল্লীগণ ছালাতের জন্য কাতারবন্দি হন তখন আল্লাহ আকাশের দরজা খুলে দেন। সাথে সাথে জান্নাতের দরজাগুলোও খুলে দেওয়া হয় এবং জান্নাতের হুরগণও মুছল্লীদের জন্য দো‘আ করেন ও ক্ষমা

১৮. *আবদুর রাজ্জাক হা/১৮৬৯; ইবনে আবু শায়বা হা/২৩৬০; বায়হাক্বী হা/২০৬৬।*
১৯. *আবুদাউদ হা/৫১৭; মিশকাত হা/৬৬৩।*
২০. *আবুদাউদ হা/৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৭০৬; মিশকাত হা/৬৫০। মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০১৬, প্রশ্ন নং ১৩/২১৩।*
২১. *তিরমিযী হা/৪১১; আহমাদ হা/১৭৬০৯; যঈফাহ হা/৬৪৩৪।*
২২. *নাসাঈ হা/৬৬৭-৬৮; আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৬৫।*
২৩. *উল্লেখ্য, আযান ও ইক্বামত দু’টিকেই হাদীছে ‘আযান’ বলা হয়েছে (মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২)। মাসিক আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০১৭, প্রশ্ন নং- ৩/১৬৩।*

প্রার্থনা করেন। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا صَفَّ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ، وَصَفُّوا لِلْقِتَالِ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَزُيِّنَ الْحُورُ الْعِينُ وَاطَّلَعْنَ، فَإِذَا أَقْبَلَ الرَّجُلُ قُلْنَ: اللَّهُمَّ انْصُرْهُ، وَإِذَا أَدْبَرَ احْتَجَبْنَ مِنْهُ، وَقُلْنَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، 'যখন মানুষ ছালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হয় এবং জিহাদের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাড়াঁয়, তখন আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর আনতনয়না হূরদেরকে সাজিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা আত্মপ্রকাশ করে। যখন ব্যক্তিটি (ছালাতে বা জিহাদে) উকি মারে, তখন হূরেরা তার জন্য দো'আ করে বলে, হে আল্লাহ! তাকে সাহায্য কর। আর যখন সে পশ্চাদপসরণ করে, তখন তারা আত্মগোপন করে এবং বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর'।[২৪]

২. দো'আ কবুলের সময় :

ইক্বামতের সময় যেমন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় তেমনি বান্দার দো'আও কবুল হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ 'যখন ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবুল করা হয়'।[২৫]

---

২৪. হাকেম হা/৬০৮৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৭৭।
২৫. আহমাদ হা/১৪৭৩০; আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৬০।

৩. মহিলারাও ইক্বামত দিবে :

আযান ইক্বামত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহিলারাও মহিলাদের মাঝে আযান ও ইক্বামত দিতে পারবে। তবে তা নিম্নস্বরে দিতে হবে।[২৬] আয়েশা (রাঃ) আযান ও ইক্বামত দিয়ে মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করেছেন।[২৭]

ইবনু ওমর (রাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, 'মহিলাদের উপর আযান আছে কি? তিনি রেগে গিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র যিকর করতে নিষেধ করব কি? হাফছাহ (রাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন, তখন ইক্বামত দিতেন'।[২৮]

উপসংহার : আযান ইসলামের অন্যতম ইবাদত ও অনন্য নিদর্শন। এতে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদানের পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত এবং চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। আযান শোনামাত্রই দুনিয়াবী সকল ব্যস্ততা ত্যাগ করে রবের স্মরণে ছুটে যাওয়ার মাঝেই নিহিত আছে মুমিনের প্রকৃত কল্যাণ। তাই আমাদের একান্ত কর্তব্য হ'ল- আযানের আদব রক্ষা করা, এর যথাযথ জবাব দেওয়া এবং আযানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে আযানের মর্যাদা অনুধাবন করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

২৬. ভূপালী : আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩২২; গৃহীত : মাসিক আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০১৩; প্রশ্ন নং- ৮/১৬৮।
২৭. বায়হাক্বী কুবরা হা/১৭৮১. তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৫৩, সনদ ছহীহ; গৃহীত : মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর ২০২১; প্রশ্ন নং- ৩৪/৭৪।
২৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৩৩৮।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

সেনাবাহিনীকে কৌশলগত ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সংসদে একাধিক সংসদ সদস্য তরুণদেরকে সরকারীভাবে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত সময়োপযোগী মনে হয়েছে। কেননা জাতীয় প্রতিরক্ষা কেবল সেনাবাহিনীর একার দায়িত্ব নয়। এটি সমগ্র জাতির গণপ্রতিরক্ষার বিষয়। রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি সুশৃঙ্খল নাগরিক প্রতিরক্ষা কাঠামো তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলবে ইনশাআল্লাহ। দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও তুরস্কসহ ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমরা মনে করি, রাষ্ট্রীয়ভাবে ভৌগলিক প্রতিরক্ষা ও ঈমানী প্রতিরক্ষা উভয়টিই সমান যরূরী। সেনাবাহিনীর মধ্যে ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের উজ্জীবন, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের সাথে তার আস্থার সম্পর্ক দৃঢ়করণ, দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তরুণ প্রজন্মকে নৈতিকভাবে প্রস্তুত করা ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো জাতি হিসাবে আমাদের আত্মমর্যাদাকে আরো অনেক বেশী সমুন্নত করবে ইনশাআল্লাহ। আর এভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক দ্বীনের সঠিক জ্ঞান, সালাফে ছালেহীনের দেখানো পথ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার সমন্বয়েই আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের দেশ ও জাতিকে হেফাযত করুন- আমীন! *(স.স.)*।

ফজর ছালাত : গুরুত্ব ও ফযীলত

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তন্মধ্যে ফজরের ছালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঈমান ও নিফাক্বের পার্থক্য নিরূপণকারী ছালাত। কেননা কেবল প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিরাই এই ছালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হ'তে পারেন। মুনাফিক্বদের কাছে এই ছালাত কঠিন মনে হয়। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বহু মুসলিম এই মহামূল্যবান ইবাদতের গুরুত্ব অনুধাবন করেন না। ফজর ছালাতের ব্যাপারে চূড়ান্ত গাফেলতি করে থাকেন। ফলে তারা নিজেদের অজান্তেই অসংখ্য বরকত, নিরাপত্তা ও নাজাতের পথ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ফজরের ছালাতের গুরুত্ব, ফযীলত ও তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

ফজর ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

১. আল্লাহ্র নিরাপত্তা ও যিম্মাদারী লাভ :

মানুষ স্বভাবতই নিরাপত্তাকামী। আমরা সবাই নিজেদের জীবন, পরিবার, সম্মান ও রিযিকের নিরাপত্তা চাই। এজন্য আমরা কত শত মাধ্যম খুঁজি; প্রভাবশালী মানুষের সুপারিশ নিই, ক্ষমতাধরদের ছত্রচ্ছায়ায় থাকতে চাই। মুমিনের জীবনে ফজরের ছালাত হ'ল সেই ইলাহী চুক্তিনামা, যার মাধ্যমে একজন মুমিন প্রতিদিন ভোরে আল্লাহ্র সাথে তার নিরাপত্তার চুক্তি নবায়ন করে নেয়। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ، فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত (জামা'আতে) পড়ল, সে আল্লাহ্র যিম্মায় চলে এল। সুতরাং আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন। কারণ যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[১] অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইখলাছের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করবে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্র অঙ্গীকার, নিরাপত্তা ও হেফাযতে থাকে'।[২] আর যে ব্যক্তি ফজর ছালাতে গাফেলতি করে আল্লাহ্র দেওয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করবে বা হালকাভাবে নিবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

আমাদের বাস্তব জীবনে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রের কোন শীর্ষ নেতা বা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে বিশেষ প্রটোকল বা নিরাপত্তা দেয়, তখন তার হাঁটাচলা ও আত্মবিশ্বাস কতটা বদলে যায়! সমাজ বা শত্রুপক্ষের কেউ তখন তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও ভয় পায়। সে তুলনায় মহাবিশ্বের একমাত্র অধিপতি, তাঁর নিরাপত্তা ক্ষমতা কত বিশাল হ'তে পারে! যে ব্যক্তি তীব্র ঘুম আর আরামের বিছানা ত্যাগ করে, কনকনে শীত বা বৃষ্টির বাধা উপেক্ষা করে ভোরবেলা আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন, মহান আল্লাহ তাকে তাঁর নিজের বিশেষ নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে নেন। ফলে আমাদের দৈনন্দিন কর্মস্থল, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার-পরিজন কিংবা রাস্তা-ঘাটের অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদাপদ এবং মানুষের হিংসা ও ক্ষতিকর চক্রান্ত–এই সবকিছুর বিপরীতে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবচেয়ে বড় রক্ষক হয়ে যান।

ছাহাবায়ে কেরাম এই নিরাপত্তার মূল্য কতই না গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। ছাহাবী হারেছ ইবনে হাসসান (রাঃ) যেদিন বিয়ে করেন, পরদিন সকালেই তিনি ফজরের ছালাতে উপস্থিত হন। তখন তাঁকে বলা হ'ল, আজ রাতেই কেবল আপনার বাসর হ'ল, অথচ সকালেই আপনি ছালাতের জন্য বেরিয়ে আসলেন?' তিনি উত্তরে বললেন, وَاللهِ إِنَّ امْرَأَةً تَمْنَعُنِي مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي جَمِيعٍ لَامْرَأَةُ سُوءٍ، 'আল্লাহ্র কসম! যে স্ত্রী আমাকে ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে বাধা দেয়, সে নিঃসন্দেহে একজন মন্দ স্ত্রী'।[৩] অথচ সমাজে বিয়ে বা কোন অনুষ্ঠানের পরদিন ফজর পড়া তো দূরের কথা, যোহর পর্যন্ত ঘুমানোকে একপ্রকার 'ট্রেন্ড' বা স্বাভাবিক বিষয় বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

২. ক্বিয়ামতের ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ নূরের সুসংবাদ :

ক্বিয়ামতের দিন হবে আন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই ভয়াবহ দিনে মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হবে আলোর। দুনিয়াতে লোডশেডিং হ'লে বা অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে গেলে আমরা যেমন মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট বা টর্চ খুঁজি, সেদিনকার সেই অন্ধকারে আমাদের পথ দেখাবে নেক আমলের আলো। ফজরের ছালাতের উদ্দেশ্যে যারা রাতের আঁধার মাড়িয়ে মসজিদে যান, তাদের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোর সুসংবাদ দিয়েছেন। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'অন্ধকারে মসজিদে গমনকারী ব্যক্তিদের ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও'।[৪] ফজরের সময় যখন চারদিক নিস্তব্ধ থাকে, তখন একজন মুমিন যখন ওযূ করে গুটিগুটি পায়ে মসজিদের দিকে হাঁটেন, তার প্রতিটি কদমে কদমে আখেরাতের জন্য নূর বা আলো জমা হ'তে থাকে। এই

১. *ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৭; মিশকাত হা/৬২৭।*
২. *আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ২/১২; মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ২/৫৪১।*
৩. *তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর ৩/২৫৩; ক্রমিক : ৩৩২৪; হাফেয মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ৫/২২৩।*
৪. *আবূদাঊদ, হা/৫৬১; তিরমিযী হা/২২৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৮১; মিশকাত হা/৭২১, সনদ ছহীহ।*

কষ্টকর আমলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাফেয ইবনু রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হি.) বলেন, 'ফজর ও এশার এই দুই সময়ে মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া অধিক কষ্টসাধ্য। কারণ এতে অন্ধকারে চলার কষ্ট রয়েছে। এ কারণেই এ আমলের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনায় ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণাঙ্গ নূরের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে'।[৫] ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলেছেন, 'সালাফগণ মনে করতেন, অন্ধকার রাতে ছালাতের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া জান্নাত লাভের কারণ'।[৬]

বর্তমানে আমাদের রাস্তাঘাট হয়তো স্ট্রিটলাইটের আলোয় আলোকিত থাকে, কিন্তু আমাদের অনেকের হৃদয়টাই যেন গাফেলতির অন্ধকারে ডুবে আছে। আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে, ভোরের মিষ্টি ঘুমকে কুরবানী দিয়ে যখন আমরা আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দেব, তখন এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সামান্য কষ্টের বিনিময়ে মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের সেই কঠিন বিপদের দিনে আমাদের পূর্ণাঙ্গ নূর দান করবেন, যা দিয়ে আমরা অনায়াসে পুলছিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ। আপনি ফজরের সুনসান নীরবতা ভেদ করে মসজিদে যাবেন, তখন এই চিন্তাটা মাথায় রাখবেন যে, আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আখেরাতে এক ফালি করে নূর জমা হচ্ছে। দেখবেন এক এলাহী প্রশান্তি আপনার অন্তরকে শীতল করে দিচ্ছে।

৩. সারারাত ইবাদতের সমান ছাওয়াব :

মানুষ বড়ই দুর্বল। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম আর জীবনসংগ্রামের পর রাতের বেলায় একটু স্বস্তির ঘুম সবারই কাম্য। সারারাত জেগে আল্লাহ্র ইবাদত করা, ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র দরবারে চোখের পানি ফেলা নিখাঁদ তাক্বওয়াশীল ছাড়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। রহমানুর রহীম বান্দাদেরকে বিনা হিসাবে অঢেল নেকী দিতে ভালোবাসেন। তাই তিনি আমাদের জন্য এমন এক সুবর্ণ সুযোগ রেখেছেন, যার মাধ্যমে আমরা রাতভর ঘুমিয়েও সারারাত ইবাদত করার বিশাল ছওয়াব লাভ করতে পারি। ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، 'যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত দাঁড়িয়ে (ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন সারারাত দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করল'।[৭]

সালাফে ছালেহীন ফজরের এই অফুরন্ত নেকী লুফে নেওয়ার জন্য কতটা মরিয়া ছিলেন, তার একটি জীবন্ত উপমা ছিলেন প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) (১৫-৯৪ হি.)। তাঁর মুক্তদাস বারদ (রহঃ) বলেন, ما نودي بالصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد، 'গত চল্লিশ বছর ধরে যখনই ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়েছে, তখনই সাঈদ (ইবনুল মুসাইয়িব) মসজিদে উপস্থিত ছিলেন'।[৮] দীর্ঘ চল্লিশটি বছর! শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, ঝড় কিংবা অসুস্থতা– কোন কিছুই তাঁকে ফজরের জামা'আত থেকে দূরে রাখতে পারেনি। যেখানে সালাফগণ চল্লিশ বছর ধরে তাকবীরে উলার সাথে জামা'আত ছাড়েননি, সেখানে আমরা চল্লিশ দিন তো দূরের কথা, টানা চল্লিশ ওয়াক্ত জামা'আত পেতেই হাঁপিয়ে উঠি! আসুন! দুনিয়ার সব হিসাব বাদ দিয়ে সারারাত ইবাদতের এই অশেষ ছাওয়াবটি লুফে নিতে আজ থেকেই এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়ার দৃঢ় সংকল্প করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন।

৪. সম্মানিত ফেরেশতা মণ্ডলীর সাক্ষ্য লাভ :

ফজর ও আছর ছালাতের ব্যাপারে যারা যত্নশীল, তাদের জন্য অন্যতম মর্যাদার ব্যাপার হ'ল, অগণিত ফেরেশতা তাদের চারপাশ ঘিরে রাখেন এবং তাদের ইবাদতের সরাসরি সাক্ষী হয়ে যান। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، 'ফেরেশতামণ্ডলী পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। ফজর ও আছরের ছালাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের ছালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা ছালাতরত অবস্থায় ছিলেন'।[৯]

ফজরের ছালাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، 'সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত তুমি ছালাত কায়েম কর এবং ফজরের ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই ফজরের ছালাত সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৭৮)*। শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) বলেন, 'ফজরের কুরআন' বলতে ফজরের ছালাতকে

---

৫. আব্দুর রহমান ইবনে রজব হাম্বলী, ফাতহুল বারী, ৬/৩৫।
৬. বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ, ২/৩৫৮।
৭. মুসলিম, হা/৬৫৬; মিশকাত হা/৬৩০।
৮. আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি./১১১৬-১২০১ খ্রি.), ছিফাতুছ ছাফওয়াহ (কায়রো: দারুল হাদীছ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), খ-১, পৃ. ৩৪৬।
৯. বুখারী হা/৫৫৫; মুসলিম হা/ ৬৩২।

বোঝানো হয়েছে। একে ‘কুরআন’ নামে অভিহিত করার কারণ হ’ল, এতে অন্যান্য ছালাতের তুলনায় দীর্ঘ কুরআন তেলাওয়াত করা শরী‘আত সম্মত। আর এতে কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। কেননা এ সময়ের তেলাওয়াতে স্বয়ং আল্লাহ এবং রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন (সাক্ষী হন)’।[১০]

৫. প্রতিদিন হজ্জ ও ওমরাহ্র নেকী লাভের সুযোগ :

হজ্জ ও ওমরাহ পালন করা প্রতিটি মুমিনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাসনা। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে অনেকের পক্ষেই এই পবিত্র সফর সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মহান আল্লাহ্র রহমতের বিশালতা এমনই যে, তিনি তাঁর বান্দাদের হৃদয়ের এই আকুতি ফিরিয়ে দেন না। তিনি আমাদের জন্য নিজ এলাকায়, নিজ শহরে বসেই প্রতিদিন হজ্জ ও ওমরাহ্র সমান নেকী অর্জনের এক অভাবনীয় সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমন কেউ যদি একনিষ্ঠতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা‘আতে সাথে আদায় করে, তবে সে প্রত্যেক ছালাতের বিনিময়ে একটি করে হজ্জের নেকী লাভ করবেন। উমামা বাহেলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، ‘যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে পবিত্র হয়ে ফরয ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করবে, তার প্রতিদান ইহরাম পরিহিত একজন হজ্জ পালনকারীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র চাশতের ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করবে, তার প্রতিদান একজন ওমরাহ পালনকারীর ন্যায়’।[১১]

আবার ফজরের ছালাত কেন্দ্রিক একটি ছোট্ট আমলের মাঝেও এই সুযোগটি নিহিত আছে। আর সেটা হ’ল ইশরাক্বের ছালাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ، ‘যে ব্যক্তি জামা‘আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্র যিকিরে মশগূল থাকে, অতঃপর (সূর্যোদয়ের পর) দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরাহ্র নেকী রয়েছে’।[১২] ফজরের ছালাতের পর দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে যিকির করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের নিয়মিত আমল ছিল। জাবের ইবনু সামুরাহ (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا، ‘নবী করীম (ছাঃ) যখন ফজরের ছালাত আদায় করতেন, তখন তিনি তাঁর ছালাতের স্থানে (মুছাল্লায়) বসে থাকতেন, যতক্ষণ না সূর্য ভালোভাবে উদিত হ’ত’।[১৩] আব্দুল মালেক ইবনে মুহাম্মাদ (১০৫-২০০হি.) বলেন, كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى يَذْكُرَ اللَّهَ، فَإِنْ كَلَّمَهُ أَحَدٌ أَجَابَهُ، ‘ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭হি.) ফজরের ছালাতের পর আল্লাহ্র যিকির সম্পন্ন না করা পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। তবে কেউ তার সাথে কথা বললে তিনি তার জবাব দিতেন’।[১৪]

ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মোটামুটি চল্লিশ মিনিট সময় পাওয়া যায়। সকালের এই বরকতময় সময়ে মসজিদে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির করে দুই রাক‘আত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে একটি কবুল হজ্জ ও ওমরাহ্ সমান নেকী লাভ করতে পারি। কোন বুদ্ধিমান মুসলিম কি এত সস্তা ও লাভজনক এই আসমানী ব্যবসা হাতছাড়া করতে পারে? প্রতিদিন সম্ভব নাও হয়, অন্তত সপ্তাহে দুই-এক দিনও তো আমরা এই সুযোগটা কাজে লাগতে পারি।

৬. জান্নাতের নিশ্চিত সুসংবাদ :

জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে ফজর ছালাতের মাঝে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ‘যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার সময়ের ছালাত (অর্থাৎ ফজর ও আছর) আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[১৫] ইমাম আবুল হাসান আল-বাগাভী (৪৩৩-৫১৬ হি) বলেন, ‘এখানে দুই ঠাণ্ডা (البردان) বলতে ফজর ও আছরের ছালাতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এ দু’টি ছালাত দিনের দুই প্রান্তে অবস্থিত’।[১৬] শায়খ উছায়মীন (১৯২৯-২০০১ খ্রি.) বলেন, ‘দুই ঠাণ্ডা বলতে ফজর ও আছরের ছালাতকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, ফজরের ছালাত আদায় করা হয় রাতের সবচেয়ে শীতল সময়ে এবং আছরের ছালাত আদায় করা হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর দিনের অপেক্ষাকৃত শীতল সময়ে। যে ব্যক্তি এ দুই ছালাত যথাযথভাবে আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ এ দুই ছালাত সংরক্ষণ করা এবং নিয়মিত আদায় করা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ’।[১৭]

আমরা সবাই জীবনের নিশ্চয়তা চাই। চাকরির নিশ্চয়তা, ব্যবসায় লাভের নিশ্চয়তা, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

১০. *আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা‘দী, তাইসীরুল কারীমির রাহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (তাফসীরে সা‘দী), পৃ. ৪৬৪।*
১১. *আবূদাঊদ হা/৫৫৮; মিশকাত/৭২৮, সনদ হাসান।*
১২. *তিরমিযী হা/৫৮৬; ছহীহাহ হা/৩৪০৩; মিশকাত হা/৯৭১, সনদ হাসান।*
১৩. *ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭০।*
১৪. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ৩৫/১৯৬; আবূ নু‘আইম হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/১৪৩; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৪০৫।*
১৫. *বুখারী, হা/৫৭৪; মুসলিম হা/৬৩৫; মিশকাত হা/৬২৫।*
১৬. *ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১২৮৩-১৪১৪ হি.), মির‘আতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ, ২/৩৩১।*
১৭. *শায়খ উছায়মীন, শারহু রিয়াযিস ছালিহীন, পৃ. ১৫১।*

এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামান্য নিশ্চয়তার জন্য আমরা কত কাঠখড় পোড়াই, অথচ চিরস্থায়ী জীবনের চূড়ান্ত আবাসস্থল 'জান্নাত'-এর নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে। ফজরের সময় বিছানার উষ্ণতা আর আছরের সময় কর্মব্যস্ততা বা আড্ডার মোহ ত্যাগ করা অনেকটা কঠিন মনে হ'তে পারে। অথচ এই সামান্য আরাম ত্যাগের বিনিময়ে আপনি চিরস্থায়ী জান্নাত পাচ্ছেন। এই ব্যবসা কি লাভজনক নয়?

৭. আল্লাহ্র দীদার লাভের সৌভাগ্য :

জান্নাতের সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ নে'মত হ'ল দয়াময় আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া। আর এই পরম সৌভাগ্য অর্জনের অন্যতম প্রধান শর্ত হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর ও আছরকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِى رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَافْعَلُوا، 'তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এ চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ এটিকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। অতএব তোমরা সক্ষম হ'লে সূর্য উঠার আগের ছালাত ও সূর্য ডুবার পরের ছালাত (যথাযথভাবে) আদায় করতে যেন পরাজিত না হও। তাহলে তাই কর'।[১৮]

দুনিয়াতে প্রিয় ব্যক্তিত্বকে একটিবার এক ঝলক দেখার জন্য আমরা কত কষ্টই না করি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকি; এমনকি দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ ছুটে যায় প্রিয় মানুষের দেখা পেতে। অথচ যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁর অফুরন্ত দয়া ও ভালোবাসা দিয়ে গোটা বিশ্বকে মমতায় আগলে রেখেছেন, সেই পরম রবের সান্নিধ্য ও দীদার (দর্শন) লাভের জন্য আমরা কি প্রতিদিন ভোরে সামান্য আরামের ঘুমটুকু ত্যাগ করে ফজরের ছালাতে হাযির হ'তে পারি না?

৮. ফজরের সুন্নাত পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে উত্তম :

পৃথিবীর ধন-সম্পদ, ক্ষমতা আর বিত্তবৈভবের প্রতি মানুষের আকর্ষণ মজ্জাগত। একটুখানি সম্পদের লোভে মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়ায়। অথচ আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য এমন এক অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছেন, যার কাছে পৃথিবীর তাবৎ ঐশ্বর্য একেবারেই তুচ্ছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، 'ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম'।[১৯] অন্যত্র তিনি বলেন, لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا، 'এই দু'টি (রাক'আত) আমার কাছে সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল সম্পদের চেয়েও অধিক প্রিয়'।[২০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে থাকা অবস্থাতেও ফজরের এই দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত ছাড়তেন না। মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، 'নবী করীম (ছাঃ) নফল ইবাদতগুলোর মধ্যে কোন কিছুর প্রতি এত বেশী গুরুত্ব দিতেন না, যতটা গুরুত্ব দিতেন ফজরের দুই রাক'আতের (সুন্নাতের) ব্যাপারে'।[২১]

এখানে একটি বিষয় গভীরভাবে ভাবার মতো। যদি ফরয ছালাতের আগের মাত্র দুই রাক'আত সুন্নাতের মর্যাদা এমন আকাশচুম্বী হয়, তবে মূল ফরয ছালাতের মর্যাদা ও প্রতিদান কত বিশাল হ'তে পারে, তা মানুষের কল্পনারও অতীত। দুনিয়ার সামান্য কিছু টাকা বা পদের জন্য আমরা সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি। অথচ প্রতিদিন ভোরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরো পৃথিবীর চেয়েও দামি সম্পদ অর্জন করার এই সুবর্ণ সুযোগ আমরা নিছক অলসতার ঘোরে অবলীলায় নষ্ট করে দিচ্ছি। জীবনের এই চূড়ান্ত ক্ষতি ও বঞ্চনা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা অত্যন্ত যরূরী।

৯. জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা :

যারা ফজরের ছালাতে ব্যাপারে যত্নশীল হয়, তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে (ফজর ও আছরের) ছালাত আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না'।[২২] আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হি.) বলেন, 'অত্র হাদীছে ফজর ও আছর ছালাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে। বিশেষভাবে এ দুই ছালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, ফজরের সময় মানুষের নিদ্রাকাল এবং আছরের সময় জীবিকা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকার সময়। সুতরাং যে ব্যক্তি এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এ দুই ছালাত সংরক্ষণ করে, তার বাহ্যিক অবস্থা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, সে অন্যান্য ছালাতের প্রতিও যত্নশীল। তদুপরি এ দু'টি সময়ে রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতারা একত্রিত হন এবং বান্দাদের আমল আল্লাহ্র নিকট পেশ করেন। তাই আশা করা যায়, এ দুই ছালাত তার গুনাহসমূহের কাফফারা হবে; ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।[২৩]

১৮. বুখারী হা/৭৪৩৪।
১৯. মুসলিম, হা/৭২৫; তিরমিযী হা/৪১৬; মিশকাত হা/১১৬৪।
২০. ছহীহ মুসলিম হা/৭২৫।
২১. ছহীহুল বুখারী হা/১১৬৯।
২২. মুসলিম, হা/৬৩৪; আবূদাঊদ হা/৪২৭।
২৩. শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ, ২/৬৮।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (মৃ. ২৩ হি.) একবার ফজরের ছালাতে সুলায়মান ইবনে আবী হাছমাহকে দেখতে না পেয়ে তার বাড়িতে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি তাকে ফজর ছালাতে দেখলাম না কেন?' তার মা বললেন, 'সে রাতে দীর্ঘক্ষণ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً، 'ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা আমার কাছে সারারাত নফল ইবাদত করার চেয়ে অধিকতর প্রিয়'।[২৪]

১০. অফুরন্ত বরকত লাভের নিশ্চয়তা :

বর্তমান সময়ে আমাদের সবচেয়ে বড় আক্ষেপের জায়গা হ'ল 'বরকত'। আমরা অনেক টাকা উপার্জন করছি, কিন্তু মাস শেষে পকেটে কিছু থাকছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকিয়ে কাজ করছি, কিন্তু কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি নেই। আমাদের সময়, মেধা এবং যোগ্যতায় আজ যেন বরকতের আকাল। এর মূল কারণ হচ্ছে আমরা দিনের সবচেয়ে বরকতময় সময়টুকু ঘুমিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছি। অথচ আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) ভোরে কাজ শুরু করার জন্য আল্লাহ্র কাছে খাসভাবে বরকতের দো'আ করেছেন। ছাখর আল-গামেদী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا، 'হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে ভোরের বরকত দান করুন'। তিনি কোন ক্ষুদ্র বা বিশাল বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করলে দিনের ভোরেই পাঠাতেন। বর্ণনাকারী ছাখর (রাঃ) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তার পণ্যদ্রব্য দিনের প্রথমভাগে (ভোরে) পাঠাতেন, ফলে তিনি সম্পদশালী হয়েছিলেন এবং এভাবে তিনি অনেক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন'।[২৫]

একটু চারপাশের বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনের দিকে তাকাই। আজকাল ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, লেখালেখি কিংবা গবেষণার মত সৃজনশীল পেশায় যারা যুক্ত আছেন, তাদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা চালু হয়েছে যে, রাত জেগে কাজ করলে মনোযোগ ভালো হয়। সারা রাত জেগে ক্লায়েন্টের কাজ বা গবেষণার প্রজেক্ট শেষ করে তারা যখন সকালে ঘুমাতে যান, তখন ফজরের ছালাত তো ছুটেই যায়, সাথে রিযিক বণ্টনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টিও হাতছাড়া হয়ে যায়। অথচ বিজ্ঞান ও বাস্তবতার আলোকে প্রমাণিত, ফজর ছালাতের পর একজন মানুষের মস্তিষ্ক যতটা সতেজ ও প্রাণবন্ত থাকে, সারাদিনে আর কখনো তেমন থাকে না। একজন ব্যবসায়ী, ডিজাইনার, লেখক বা গবেষক যদি সকালে ফজর পড়ে আল্লাহ্র নাম নিয়ে তাঁর কাজ শুরু করেন, নবীর দো'আর বরকতে অল্প সময়ে তিনি যে পরিমাণ ও যে মানের কাজ করতে পারবেন, সারারাত জেগেও তা সম্ভব নয়।

২৪. *ছহীহুত তারগীব হা/৪২৩; সনদ ছহীহ।*
২৫. *আবুদাঊদ হা/২৬০৬; তিরমিযী হা/১২১২; মিশকাত হা/৩৯০৮; ছহীহ হাদীছ।*

সালাফে ছালেহীন বা আমাদের পূর্বসূরীগণ ভোরের এই সময়টুকু ঘুমিয়ে কাটানোকে কতটা অপসন্দ করতেন, তা তাদের জীবনী পড়লে আমরা বুঝতে পারি। একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর এক ছেলেকে ভোর বেলা ফজরের পর ঘুমাতে দেখে বলেন, قُمْ أَتَنَامُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُقْسَمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ؟ 'ওঠো! তুমি কি এমন সময়ে ঘুমাচ্ছ, যখন রিযিক বণ্টন করা হয়?'[২৬] আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা (১৭-৮৩ হি.) বলেন, 'একবার ওমর ইবনু মুলাইক আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি সকালবেলায় (ফজরের পর) ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে পা দিয়ে নাড়া দিয়ে বললেন, أترقد فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْتَشِر فِيهَا عِبَاد الله، 'তুমি কি এমন সময় ঘুমিয়ে আছ, যখন আল্লাহ্র বান্দারা জীবিকা ও কল্যাণের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ে?'[২৭]

হিশাম ইবনু উরওয়াহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) তাঁর সন্তানদেরকে সকালে ফজরের পর ঘুমাতে নিষেধ করতেন। প্রখ্যাত তাবেঈ উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহ.) (২৩-৯৪ হি.) বলেন, إِنِّي لَأَسْمَعُ بِالرَّجُلِ يَتَصَبَّحُ فَأَزْهَدُ فِيهِ، 'আমি যখন শুনি যে কোন ব্যক্তি সকালে ঘুমায়, তখন তার প্রতি আমার অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় (তাকে অপসন্দ করি)'।[২৮] একদা প্রখ্যাত তাবেঈ তাঊস ইবনু কায়সান (৩৩-১০৬ হি.) ফজরের ছালাতের পর এক ব্যক্তির খোঁজে তার বাড়িতে গেলেন। তাকে বলা হ'ল, সে এখনো ঘুমিয়ে আছে। তখন তাঊস অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ أَحَداً يَنَامُ فِي السَّحَرِ، 'আমি তো ভাবতেই পারি না যে, ভোর বেলা কেউ ঘুমিয়ে থাকতে পারে!'[২৯]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, وَنَوْمُ الصُّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ تَطْلُبُ فِيهِ الْخَلِيقَةُ أَرْزَاقَهَا، وَهُوَ وَقْتُ قِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ، فَنَوْمُهُ حِرْمَانٌ إِلَّا لِعَارِضٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، 'ফজরের পরের ঘুম রিযিককে বাধাগ্রস্ত করে।

২৬. *হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খইরিল ইবাদ, তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাউত্ব ও আব্দুল ক্বাদির আল-আরনাউত্ব (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), খ- ৪, পৃ. ২২১।*
২৭. *জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), আল-লা'আলি আল-মাছনূ'আহ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), ২/১৩৪।*
২৮. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭০৮৫; ১৪/১৬৭।*
২৯. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৪২; আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৪/৬; ইবনু কুদামা, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, পৃ. ৬৫।*

কারণ এটি এমন এক সময় যখন সৃষ্টিকূল তাদের রিযিক অন্বেষণ করে এবং এটি রিযিক বণ্টনের সময়। তাই এ সময়ের ঘুম হ'ল (রিযিক থেকে) বঞ্চনা; তবে কোন অসুস্থতা বা বিশেষ প্রয়োজন থাকলে ভিন্ন কথা'।[৩০]

আধুনিক কর্পোরেট বিশ্বেও যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তবে দেখতে পাব পৃথিবীর সবচেয়ে সফল মানুষদের অন্যতম প্রধান অভ্যাস হলো ভোরে দিন শুরু করা। অথচ আজ আমাদের অনেক মুসলিম যুবক সারারাত সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটায় এবং সূর্য মাথার ওপর ওঠার পর আলস্যভরে ঘুম থেকে জাগে। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে হতাশা, বিষণ্নতা আর রিযিকের তীব্র সংকট। অফুরন্ত রহমত আর রিযিকের দরজা যখন খোলা থাকে, তখন আমরা অঘোরে ঘুমিয়ে থাকি। জীবনে প্রকৃত বরকত, প্রাচুর্য ও মানসিক প্রশান্তি আনতে হ'লে ফজরের ছালাত আদায় করে রবের কাছে রিযিক প্রার্থনার মাধ্যমে দিন শুরু করার কোন বিকল্প নেই। আমরা আশেপাশে এমন অনেক মানুষের সন্ধান পাব, যারা নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার-পরিজনে, কাজ-কর্মে বরকত হারিয়ে ফেলেছেন। এমন ব্যক্তিদের জীবনের দিকে গভীরভাবে তাকালে দেখতে পাবো যে, তারা ফজরের বরকতময় সময়গুলোকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে মারাত্মকভাবে গাফেল।

উপসংহার :

জীবনের যে সময়টুকু অবহেলায় পার হয়ে গেছে, তার জন্য আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চাই। আজ থেকেই ফজর ছালাতকে আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করি। শয়তানের দাসত্ব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে প্রতিদিনের ভোরের স্নিগ্ধতায় আমরা যেন আল্লাহর রহমত, নিরাপত্তা ও জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে দিনের সূচনা করতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত বিশেষ করে ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৩০. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ, ৪/২২২।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : আগস্ট ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ আগস্ট	১৭ ছফর	১৭ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:০৬	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	১৯ ছফর	১৯ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৭	০৫:২৯	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৩
০৫ আগস্ট	২১ ছফর	২১ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:০৯	০৫:৩০	১২:০৫	০৩:৩০	০৬:৪০	০৮:০১
০৭ আগস্ট	২৩ ছফর	২৩ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:১০	০৫:৩১	১২:০৫	০৩:৩০	০৬:৩৮	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	২৫ ছফর	২৫ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:১১	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:৩৭	০৭:৫৮
১১ আগস্ট	২৭ ছফর	২৭ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:১২	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:৩৬	০৭:৫৬
১৩ আগস্ট	২৯ ছফর	২৯ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:১৪	০৫:৩৩	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:৩৪	০৭:৫৪
১৫ আগস্ট	০১ রবীঃ আউঃ	৩১ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:১৫	০৫:৩৪	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:৩২	০৭:৫২
১৭ আগস্ট	০৩ রবীঃ আউঃ	০২ ভাদ্র	সোমবার	০৪:১৬	০৫:৩৫	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:৩১	০৭:৫০
১৯ আগস্ট	০৫ রবীঃ আউঃ	০৪ ভাদ্র	বুধবার	০৪:১৭	০৫:৩৫	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৪৮
২১ আগস্ট	০৭ রবীঃ আউঃ	০৬ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:১৮	০৫:৩৬	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৭	০৭:৪৬
২৩ আগস্ট	০৯ রবীঃ আউঃ	০৮ ভাদ্র	রবিবার	০৪:১৯	০৫:৩৭	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৬	০৭:৪৪
২৫ আগস্ট	১১ রবীঃ আউঃ	১০ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২০	০৫:৩৮	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪২
২৭ আগস্ট	১৩ রবীঃ আউঃ	১২ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২১	০৫:৩৯	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২২	০৭:৪০
২৯ আগস্ট	১৫ রবীঃ আউঃ	১৪ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২২	০৫:৩৯	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২০	০৭:৩৭
৩১ আগস্ট	১৭ রবীঃ আউঃ	১৬ ভাদ	সোমবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৯	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৩৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−২	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	+১	+১	০	০	০
শরীয়তপুর	+১	+১	−১	০	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	−১	০	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৩	−১	০	০	০
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩	+৫	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+১	+২	+১
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−২	+২	+৩	+৩	+৪
ময়মনসিংহ	−২	০	+২	+১	+২
জামালপুর	০	+৩	+৪	+৪	+৫
নেত্রকোণা	−৪	−১	+১	০	+১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৭	+৬	+৩	+৪	+৩
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+২	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৪	+৪	+৪	+৫	+৪
মাগুরা	+৪	+৪	+৩	+৪	+৩
খুলনা	+৫	+৪	+২	+৩	+২
বাগেরহাট	+৪	+৩	০	+১	০
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৩	+১	−১	০	−১
পটুয়াখালী	+৩	+১	−২	−১	−২
পিরোজপুর	+৪	+২	−১	০	−১
বরিশাল	+২	+১	−২	−১	−২
ভোলা	+১	−১	−৪	−৩	−৪
বরগুনা	+৪	+২	−২	−১	−২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৪	+৪	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৫	+৬	+৬	+৬
রাজশাহী	+৬	+৮	+৮	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৬	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+২	+৬	+৭	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+১০	+১০	+১১
নওগা	+৪	+৭	+৮	+৭	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+২	+৮	+১২	+১১	+১৩
দিনাজপুর	+৩	+৮	+১০	+৯	+১১
লালমণিরহাট	০	+৫	+৮	+৭	+৯
নীলফামারী	+১	+৭	+১০	+৯	+১১
গাইবান্ধা	০	+৪	+৬	+৫	+৭
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৯	+১২	+১১	+১৩
রংপুর	০	+৫	+৮	+৭	+৯
কুড়িগ্রাম	−১	+৩	+৬	+৬	+৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৪	−৩	−৪
ফেনী	−৩	−৪	−৫	−৫	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৪	−৩	−৩	−২	−৩
রাঙ্গামাটি	−৫	−৭	−৯	−৮	−৯
নোয়াখালী	−১	−২	−৫	−৪	−৫
চাঁদপুর	−১	−১	−৩	−২	−৩
লক্ষ্মীপুর	০	−১	−৩	−৩	−৩
চট্টগ্রাম	−৩	−৫	−৮	−৭	−৮
কক্সবাজার	−২	−৬	−১১	−৯	−১১
খাগড়াছড়ি	−৫	−৬	−৭	−৬	−৭
বান্দরবান	−৪	−৭	−১১	−৯	−১১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৮	−৫	−৪	−৪	−৩
মৌলভীবাযার	−৭	−৫	−৫	−৪	−৪
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
সুনামগঞ্জ	−৭	−৪	−২	−২	−২

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

মার্কসের দর্শন বনাম ইসলাম : ভ্রান্ত তত্ত্ব বনাম শাশ্বত সত্য

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রবেশের আগেই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের নাম ও মতবাদের সাথে প্রথম পরিচয়। তরুণ মনে তখন এক ধরনের আকর্ষণ ও মুগ্ধতা জন্মেছিল। মনে হ'ত, এই মানুষগুলো তাদের যুগে নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কি তীব্র প্রতিবাদই না করেছিলেন! 'বুর্জোয়া' (Bourgeoisie), 'প্রলেতারিয়েত' (Proletariat), 'শ্রেণীসংগ্রাম', 'কমরেড' এসব শব্দে কেমন যেন রক্তে আগুন লাগার অনুভব হ'ত। পৃথিবীকে অন্যায় ও বৈষম্যমুক্ত করার স্বপ্ন, শোষিত শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আহ্বান এবং একটি সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণের প্রত্যয় স্বাভাবিকভাবেই সমাজসচেতন তরুণদের আন্দোলিত করে। কাজী নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা, বাধনহারা, ব্যথার দান প্রভৃতি বিংশ শতকের সাহিত্য ও উপন্যাসগুলোতে রুশ-বিপ্লব পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক আবহ আর বিপ্লবী মানবতাবাদ ও সাম্যচেতনার যে প্রবল স্রোত দেখা যায়, তা সহসাই তরুণ হৃদয়ে এক প্রতিবাদী চেতনা আর পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।

পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসের পাঠগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কার্ল মার্কস সামাজিক সমস্যাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং রোগ নির্ণয়ও যথার্থভাবে করেছিলেন বটে; কিন্তু তার দেয়া চিকিৎসা ছিল একদমই ভ্রান্ত ও অবাস্তব। ইতিহাসের কাঠগড়ায় সেটা নিছক আকাশ-কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

তবুও এটাও সত্য যে, আজও কোন চিন্তাশীল ও চেতনাদৃপ্ত তরুণ যদি মার্কসের সাহিত্য পাঠ করে, তবে তার হৃদয়ের গভীরে মানবতার জন্য করুণার আর্তি জেগে উঠতে পারে। নিপীড়িত মানুষের জন্য সহানুভূতি, ধনী-দরিদ্র বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা আন্দোলিত করতে পারে। এমনকি ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে সে কখনও মনে করতে পারে যে, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির একমাত্র ভাষা বুঝি মার্কসবাদই। সেজন্য মার্কসবাদের সাথে ইসলামের পার্থক্যের জায়গাগুলো আমাদের তরুণদের সামনে স্পষ্ট থাকা দরকার।

মার্কস আসলে কি ভেবেছিলেন?

মার্কস মূলত একটা সরল মানবিক বোধ থেকেই সমাজের পুঁজিবাদের ভেতরের শোষণটা কাছ থেকে দেখেছিলেন। তিনি মৌলিক যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন তা হ'ল, কেন শ্রমিকের শ্রম-মূল্যের একটা অংশ মালিকরা কেড়ে নেয় আর যাবতীয় সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় কিছু নির্দিষ্ট হাতে? তার সেই প্রশ্ন আজও যে কোন মানবিক মানুষ খুঁজে বেড়াবে গভীর আফসোস নিয়ে। কেন ২০২৫ সালে যখন যান্ত্রিক সভ্যতার অনবদ্য ঝলকানিতে বিশ্ব বিমুগ্ধ, তখনও বিশ্বে ক্ষুধার যাতনা কমছে না? কেন বিশ্বের বিলিয়নিয়ারদের সম্পদ আগের পাঁচ বছরের গড় হারের তিন গুণ বেগে বেড়ে যখন রেকর্ড ১৮.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, তখন বিশ্বের অর্ধেক মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে? কেন বর্তমান বিশ্বে প্রতি চারজনের একজনই ক্ষুধায় ভোগে? সমাজের এই বৈষম্য অতি বাস্তব, যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

মার্কসীয় তত্ত্বের মূলকথা :

কার্ল হাইনরিখ মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) মূলত ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ। ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পর তিনি শৈশবেই পরিবারের সাথে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। শিল্পবিপ্লবের যুগে ইউরোপের কলকারখানায় শ্রমিকদের পশুর মত জীবনযাপন, শিশুশ্রম, ১৪-১৬ ঘণ্টার কর্মদিন এবং মালিকশ্রেণীর লাগামহীন মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা দেখে মার্কসের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগে। তিনি ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের সাথে যৌথভাবে রচনা করেন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮) এবং পরে রচনা করেন তার সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থ দাস কাপিটাল (১৮৬৭)। তার এই চিন্তাধারারই ফসল হ'ল আজকের রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ, যা তার মৃত্যুর কিছু কাল পরে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানচিত্র এঁকে দিয়েছিল।[১] তার মতবাদের মূলকথাগুলো নিম্নরূপ :

(১) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) **:**

মার্কসের সমগ্র চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তর হ'ল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। তার মূল দাবী হ'ল, মানুষ তার সত্তাগতভাবে বা জন্মগতভাবে কোন নির্দিষ্ট চেতনার অধিকারী নয়, বরং সামাজিক অবস্থানই তার চেতনা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ মানুষ কী ভাবে, কী বিশ্বাস করে, কোন নৈতিকতা মানে, এসব কিছুই নির্ধারিত হয় সে কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে জন্মেছে তার উপর। তার ধারণামতে, একজন জমিদারের সন্তান এবং একজন ভূমিহীন চাষীর সন্তান একই ধর্মগ্রন্থ পড়েও ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে। কারণ তাদের বস্তুগত অস্তিত্ব এক নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা : (১) প্রথম পর্যায় : আদিম সাম্যবাদ (Primitive Communism), যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। (২) দ্বিতীয় পর্যায় : দাস সমাজ (Slave Society), যেখানে লড়াই শুরু হয় দাসমালিক বনাম দাস। (৩) তৃতীয় পর্যায় : সামন্তবাদ (Feudalism), যেখানে লড়াই চলেছিল ভূস্বামী/জমিদার বনাম ভূমিদাস/কৃষক। (৪) চতুর্থ পর্যায় : পুঁজিবাদ (Capitalism), বর্তমান যে লড়াই চলমান তথা বুর্জোয়া (পুঁজিপতি/বিত্তবান) বনাম প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক/সর্বহারা)। আর (৫) পঞ্চম পর্যায় : সাম্যবাদ (Communism), যা শ্রেণীহীন সমাজকে বুঝায়, যেখানে মালিক-শ্রমিক বলে কিছু থাকবে না, সবাই সমান। সেখানে

১. *ড. আমীনুল ইসলাম, সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ৪র্থ প্রকাশ : ২০০১), পৃ. ৮৫-৮৭।*

কলকারখানায় উৎপাদন হবে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত মালিকানার অধীনে এবং সকল মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকারের ভিত্তিতে বসবাস করবে। অবসান হবে সব রকম সংঘর্ষের। আর এটাই তার মতে, মানবসমাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, যা বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।[২]

(২) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) :

কার্ল মার্কসের দর্শন ও সমাজতত্ত্বের মূল ভিত্তি হ'ল 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'। এই তত্ত্বটি মূলত জার্মান দার্শনিক জর্জ উইলহেম ফ্রিডরিখ হেগেলের 'দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি' (Dialectics) এবং লুডউইগ ফয়ারবাখের 'বস্তুবাদ' (Materialism)-এর এক অদ্ভুত মিশ্রণ। তবে মার্কস হেগেলের পদ্ধতি গ্রহণ করলেও তার মূল চেতনাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন। মার্কস নিজেই বলেছিলেন, 'আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হেগেলের পদ্ধতি থেকে কেবল আলাদাই নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। হেগেলের কাছে মানুষের মস্তিস্কের জীবন-প্রক্রিয়া (যাকে তিনি ধারণা বা Idea নামে অভিহিত করেছেন) হ'ল বাস্তব জগতের সৃষ্টিকর্তা। পক্ষান্তরে আমার কাছে, 'ধারণা' হ'ল মানুষের মনে প্রতিফলিত এবং চিন্তা রূপে রূপান্তরিত বস্তুগত জগৎ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩]

হেগেল বিশ্বাস করতেন, এই মহাবিশ্ব এবং মানব ইতিহাসের চালিকাশক্তি হ'ল একটি পরম চেতনা বা ধারণা (Absolute Idea/Geist)। অর্থাৎ মানুষের চিন্তার পরিবর্তন আগে হয়, তারপর সমাজের পরিবর্তন হয়। কিন্তু মার্কস হেগেলের এই তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ইতিহাস কোন আদর্শ বা ধারণা দ্বারা চালিত হয় না; বরং চালিত হয় সম্পূর্ণ বস্তুগত ও অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা। তাই কোন ধর্ম, ভাববাদী আদর্শ বা পরম চেতনা নয়, বরং সমাজ ও অর্থনীতিই মানুষের জীবনগতি নির্ধারণ করে। তার মতে, অর্থনীতিই মানবজীবনের সবকিছু। তাই আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হ'লে সমাজের সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটে।[৪]

মার্কস ডারউইনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তার তত্ত্বমতে, প্রকৃতির মত সমাজও স্থবির নয়, বরং এটি পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই বিবর্তনের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা : ১. থিসিস (Thesis- বিদ্যমান ব্যবস্থা) অর্থাৎ সমাজের একটি প্রতিষ্ঠিত রূপ বা ব্যবস্থা। ২. অ্যান্টিথিসিস (Antithesis- বিরোধী শক্তি) অর্থাৎ থিসিসের গর্ভ থেকেই তার ধ্বংসের উপাদান বা বিরোধী শক্তির জন্ম হয়। এদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ৩. সিনথেসিস (Synthesis- নতুন ব্যবস্থা) অর্থাৎ থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্বের ফলে একটি নতুন ও উন্নত ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সিনথেসিসটি পরবর্তীতে আবার নতুন 'থিসিস'-এ পরিণত হয় এবং পুনরায় দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

কার্ল মার্কস এই সূত্রটি মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিবর্তনে প্রয়োগ করেছেন এভাবে যে,

পুঁজিবাদ (Thesis) : যেখানে পুঁজিপতিরা উৎপাদন যন্ত্রের মালিক এবং তারা শ্রমিকদের শোষণ করে।

শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ (Antithesis) : শোষণের শিকার হয়ে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী তৈরী হয় এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব বা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

সাম্যবাদ/সমাজতন্ত্র (Synthesis) : এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতিতে একটি শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজ বা 'সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসের দাবী ছিল, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমাজে আর কোন নতুন 'অ্যান্টিথিসিস' বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে না। এটাই হবে ইতিহাসের চূড়ান্ত গন্তব্য।[৫]

মূলত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একটি নাস্তিক্যবাদী দর্শন। এটি মনে করে, এই মানব জীবন ও ইতিহাসের পরিবর্তনের পিছনে কোন স্রষ্টা তথা আল্লাহ্‌র ভূমিকা নেই এবং মানুষের নৈতিক ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু নেই। বরং এই পৃথিবীতে বস্তুই সবকিছু। 'টাকা-পয়সা আর রুটি-রুযী'র দ্বন্দ্বই একমাত্র সত্য।[৬]

(৩) বাড়তি মূল্য তত্ত্ব (Theory of Surplus Value) :

এটি মার্কসের সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনৈতিক তত্ত্ব Das Kapital (১৮৬৭)-এর অন্যতম প্রধান ধারণা। তার মতে, একজন শ্রমিক যদি ৮ ঘণ্টা কাজ করে, হয়তো ৪ ঘণ্টাতেই তার মজুরীর সমতুল্য পণ্য তৈরী করে ফেলে। কিন্তু বাকী ৪ ঘণ্টার যে শ্রমের মূল্য তা মালিক কেড়ে নেয়। আর এটাই বাড়তি মূল্য (Surplus Value)। অন্যভাবে পণ্যদ্রব্যের প্রকৃত উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে, সেটাই হ'ল বাড়তি মূল্য, যা পুঁজিপতিরা মজুরের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। এই বাড়তি মূল্যই শোষণ, যা পুঁজিপতিদের পুঁজি বৃদ্ধির রহস্য। অর্থাৎ মার্কস ধরে নিয়েছিলেন শুধু শ্রমই মূল্য তৈরী করে (Labour can make value)। অথচ মালিক বা উদ্যোক্তারও ঝুঁকি আছে। শ্রমের বাইরে প্রযুক্তি ও মূলধনেরও ভূমিকা আছে, যা তিনি আমলে নেননি। তাই তার 'শ্রমমূল্য তত্ত্ব' (Labour Theory of Value) একটি অকার্যকর তত্ত্বে পরিণত হয়েছে।[৭]

(৪) শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব (Theory of Class Struggle) :

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮)-এর প্রথম বাক্য হ'ল, 'এ পর্যন্ত বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস হ'ল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস'। তার মতে, সমাজ দুই ভাবে বিভক্ত হয়েছে। (১) সম্পদশালী (The Haves)। (২) সর্বহারা (The Have Nots)। বৈষম্যের কারণে এই বুর্জোয়া শ্রেণী (মালিক) বনাম প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক শ্রেণী)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে এবং এই দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবে বিপ্লবে রূপ নেবে। মজার ব্যাপার হ'ল

২. *Karl Marx, Das Kapital (Moore, 1906), pdf/31.*
৩. *M. Umar Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), pp. 202-215.*
৪. *মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম (ঢাকা : বুক ফোরাম; ১ম প্রকাশ : ১৯৭৫) পৃ. ১৮৭।*
৫. *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ. ৮৮-৯১।*
৬. *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, পৃ. ১৮৪।*
৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী; ৫ম প্রকাশ : ১৯৯৪) পৃ. ১৩৩-১৩৪।*

মার্কসের সেই কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব জার্মানী বা ইংল্যান্ডের মত শিল্পপ্রধান দেশে নয়, বরং ঘটেছিল কৃষিনির্ভর রাশিয়া (১৯১৭) ও চীনে (১৯৪৯), যা মার্কসের নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।

(৫) বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব (Theory of Alienation) :

মার্কসের সবচেয়ে মানবিক তত্ত্বের নাম Economic and Philosophical Manuscripts (১৮৪৪)। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক চার স্তরে বিচ্ছিন্ন হয়। যথা : (১) প্রথম স্তর : উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ শ্রমিক জুতা তৈরি করে কিন্তু জুতার মালিক হয় না। (২) দ্বিতীয় স্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, অর্থাৎ কাজটি আনন্দের নয়, যন্ত্রণার। (৩) তৃতীয় স্তর : মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। ফলে মানুষ তার সৃজনশীলতা হারায়, যন্ত্রে পরিণত হয়। (৪) চতুর্থ স্তর : অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা পুঁজিবাদ মানুষকে প্রতিযোগী বানায়, সহযোগী নয়। মার্কসের এই বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব যথারীতি কেবলই অর্থনৈতিক। মানুষের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অন্য কারণগুলো এখানে অনুপস্থিত।[৮]

(৬) ধর্মবিরোধিতা :

মার্কসের বিখ্যাত উক্তি হ'ল, 'ধর্ম এক নিপীড়িত সত্তার দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয় এবং আত্মাহীন পরিস্থিতির আত্মা। ধর্ম হ'ল জনগণের আফিম' (Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people)।[৯] ধর্মের বিরুদ্ধে মার্কসের যুক্তি তিনটি। যথা :

প্রথমতঃ ধর্ম মানুষকে ইহ জীবনের কষ্ট সহ্য করতে শেখায় পরকালের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ফলে বিদ্যমান শোষণ টিকে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম শাসকশ্রেণী তৈরী করে ও রক্ষা করে। রাজা আল্লাহ্র প্রতিনিধি এই ধারণা শাসনকে বৈধতা দেয়।

তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক মুক্তি এলে ধর্মের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।[১০]

মজার ব্যাপার হ'ল মার্কসের নিজের তত্ত্বটাই একটি নতুন ধর্মের রূপ নিয়েছে। যেমন সমাজবিজ্ঞানী রেমন্ড অ্যারোন মার্কসবাদকে secular religion বা ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম বলেছেন। তার মতে, মার্ক্সবাদেও আছে পবিত্র গ্রন্থ (দাস কাপিটাল), নবী (মার্কস), বিশ্বাসযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী (শ্রেণীহীন সমাজ), কাফের (বুর্জোয়া) এবং মুমিন (প্রলেতারিয়েত)।[১১]

যেখানে মার্কসের তত্ত্ব টিকতে পারল না :

মার্কসের সমস্যা হ'ল যে, তিনি রোগ-নির্ণয়ে যতটা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন, প্রতিকারে ততটাই অন্ধত্ব দেখিয়েছেন। কারণ তিনি যে বিশ্বদৃষ্টিতে সমস্যার গোড়া দেখেছিলেন, তা সত্য হ'লেও সমাধানের পথকে তিনি দেখেছেন নিরেট সেক্যুলার দৃষ্টিতে। তাওহীদের বিশ্বদৃষ্টিতে সত্যের সন্ধান করতে না পারায় তার তত্ত্ব ইতিহাসের পরীক্ষায় যথারীতি চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখিয়েছে। যার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

১. তার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়েছে : মার্কস বলেছিলেন, বিপ্লব প্রথমেই ঘটবে কোন শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশে। সেটা হ'তে পারে জার্মানী বা ব্রিটেন। কেননা সেখানে বৈষম্য বেশী। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। বিপ্লব ঘটল তৎকালীন কৃষিনির্ভর আর অনুন্নত রাশিয়া ও চীনে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দেশের শোষিত শ্রেণীর মানুষগুলোই সংঘর্ষে নামল না, কোন বিপ্লবের পথে হাঁটল না। ফলে তার তত্ত্বের মূল বাস্তবতা নাকচ হয়ে গেছে।

২. রাষ্ট্র বিলীন হয়নি, বরং দানব হয়ে উঠেছে : মার্কসের প্রতিশ্রুতি ছিল, বিপ্লবের পর রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে একটি সার্বজনীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছিল উল্টোটা। সোভিয়েত রাশিয়া আর মাও-চীনে রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের সবচেয়ে নিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিলুপ্ত হ'ল, কিন্তু বৈষম্য বিলুপ্ত হ'ল না। কেবল নতুন শ্রেণী তৈরী হ'ল। যারা হ'ল দল-আমলা শ্রেণী। ব্যক্তি মালিকানা বিলুপ্ত হ'লেও এর বিপরীতে রাষ্ট্র নিজেই হয়ে উঠল নির্মম মালিক।

তার প্রস্তাবিত শ্রেণী সগ্রামের পথ ধরে পরবর্তীকালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীশত্রু উৎখাত ও নির্মূলের নামে কত লক্ষ বনু আদমকে যে বন্দুকের নলের শিকার বানিয়েছিল, কত লক্ষ লোক যে ভিটেমাটি হ'তে উৎখাত হয়ে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল, তার হদিস মিলবে না কোন দিনই। সমাজতন্ত্র যখন একটা সংগঠিত শক্তির রূপ নেওয়া শুরু করে তখন তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার হরণ, সর্বহারার একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) নামে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মালিকানার নামে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে রাষ্ট্রীয় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার, যা ছিল পুরোটাই এক মহা যুলুমের রাজত্ব।[১২] স্বয়ং লেনিনের মতে যে কোন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে দু'টো জিনিস অপরিহার্য, যুদ্ধ আর স্বৈরতন্ত্র। মূলত যুদ্ধ আর একনায়কতন্ত্র বা প্রবল স্বৈরতন্ত্র ছাড়া কোন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র একদণ্ড কায়েমই থাকতে পারে না।[১৩]

---

৮. *Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 (Moscow : Marx-Engels Institute, 1932).*

৯. *Karl Marx, A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right (Introduction) (Marx-Engels Collected Works (MECW), p. 3/175-76.*

১০. *Karl Marx & F Engels, Manifesto of the Communist Party (1969 : In Selected works), p. 1/98–137).*

১১. *R. Aron, The opium of the intellectuals. Secker & Warburg (Original work published 1955).*

১২. *হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ (রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউণ্ডেশন; ৪র্থ প্রকাশ : ২০০৫) পৃ. ৩১২।*

১৩. *R. Aron, The opium of the intellectuals. Secker & Warburg (Original work published 1955).*

৩. সম্পদের যৌথ মালিকানা প্রণোদনা ধ্বংস করেছে : ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফার প্রণোদনা কেড়ে নেওয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। সোভিয়েত কৃষি-যৌথীকরণ এবং চীনের মহাঅগ্রগমন (Great Leap Forward) নীতি ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষগুলোর জন্ম দিয়েছিল যেখানে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল এমন এক ব্যবস্থায়, যা মানবিক সমাজ ও শোষণমুক্ত সমাজের নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৪]

৪. ঈশ্বরহীন রাষ্ট্রই হয়ে উঠল নতুন ঈশ্বর : ধর্মকে 'আফিম' বলে বিদায় করার পর জবাবদিহিতার শূন্যস্থান পূরণ করল রাষ্ট্র ও নেতা নিজেই। স্তালিন-মাওয়ের প্রতি ব্যক্তিপূজা প্রমাণ করে যে, মানুষ তাওহীদ থেকে মুখ ফেরালে নিশ্চিতভাবে অন্য কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ক্ষমতাকেই দেবত্বের আসনে বসিয়ে দেয়। মার্কস ধর্মকে নিপীড়নের হাতিয়ার বলেছিলেন, কিন্তু তারই অনুসারীরা সেই নিপীড়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিল।

ফলে ধর্মকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত রাশিয়া, মাও চীন, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি দেশগুলোতে শোষণ কমেনি বরং নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। ধর্মহীন সোভিয়েত রাশিয়াই কেবল হত্যা করেছিল ৭ কোটিরও বেশী মানুষ। মুসলিম অধ্যুষিত দাগেস্তানে তারা পায়কারী হারে হত্যা করেছিল ১০ লক্ষ মুসলমানকে।[১৫]

৫. মানুষকে কেবল অর্থনৈতিক প্রাণী বলার ভুল : মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানুষের জীবন, সমাজ, নৈতিকতা, আইন, সংস্কৃতি ও চিন্তাকে প্রধানত অর্থনীতির আলোকে ব্যাখ্যা করে। ফলে মানুষের বিবেক, আত্মত্যাগ, প্রেম, মমতা ও নৈতিক মূল্যবোধকেও বস্তুগত ও সামাজিক অবস্থার ফল হিসেবে দেখে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন বহু মানবিক আচরণ রয়েছে, যা কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। একজন মা নিজের ক্ষুধা সহ্য করে সন্তানের মুখে কেন আহার তুলে দেন? একজন সৈনিক জাতির স্বার্থে নিজের জীবন কেন বিসর্জন দেন? মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কেন অন্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন? এর কোন ব্যাখ্যা বস্তুবাদ দিতে পারে না। মূলত এসব আচরণের পেছনে অর্থনৈতিক হিসাব নয়; বরং কাজ করে নৈতিক দায়বদ্ধতা, বিবেক, ভালোবাসা ও আত্মিক প্রেরণা। ইসলাম মানুষের এই পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরে। মানুষের দেহ মাটি থেকে সৃষ্টি হলেও তার মধ্যে আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে রূহ দান করেছেন। তাই মানুষ কেবল অর্থনৈতিক বা জৈবিক সত্তা নয়, সে এক রূহানী নৈতিক সত্তা, যার জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

মার্কসবাদের চূড়ান্ত পরিণতি :

শ্রেণীশত্রু উৎখাতের নামে বিংশ শতাব্দী জুড়ে মধ্যএশিয়া, পূর্বএশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোতে যা ঘটেছিল তার চিত্র অতীব ভয়াবহ। সোভিয়েত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ১৯১৭ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে শুধু নিজের নাগরিকদের মধ্যেই প্রায় ৬১.৯ মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেছে। এরা বিদেশী কোন শত্রু ছিল না। বরং এরা ছিল সেই 'সর্বহারা' জনগণ, যাদের মুক্তির নামেই বিপ্লব হয়েছিল।[১৬] হাতুড়ি-শাবল-কাস্তে নিয়ে যারা 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান দিয়েছিল, তারাই হয়েছিল সবচেয়ে বেশী অত্যাচারিত।

সোভিয়েত শাসনের সবচেয়ে ভয়াবহ উপহার ছিল 'গুলাগ' তথা বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির ব্যবস্থা। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৯১৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন মানুষকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে জোরপূর্বক সুদূর সাইবেরিয়া, কোলিমা বা উত্তর মেরু অঞ্চলের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয় এবং এর মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষই ক্ষুধা, শীত আর নির্যাতনে মারা যায়। যাদের পাঠানো হ'ত তাদের অধিকাংশ ছিলেন কৃষক, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী। 'শ্রেণীশত্রু' তকমা দিয়ে তাদের সেখানে পাঠানো হয়।[১৭] ১৯০৭ সালে রাশিয়ায় ছিল ৭০০০ মসজিদ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৮০০টি। ১৯০৮ সালে এগুলোর কোন অস্তিত্ব ছিল না। গ্রন্থাগারগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়। এই নৃশংসতা স্বয়ং তাতার, মোঙ্গলদের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছিল।[১৮]

চীনে ১৯৬৬-৭৬ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেন মাও সেতুং। 'রেড গার্ড আন্দোলনে'র নামে শুরু করা হয় 'শুদ্ধি অভিযান'। এই অভিযানে বৈষম্য দূর করার নামে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের জনসমক্ষে অপমান করা হয়। তাদের 'মেথরের কাজ' করতে বাধ্য করা হয়। লক্ষ লক্ষ বইপুস্তক পোড়ানো হয়, উপসনালয়-মসজিদ ভাঙা হয়। প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মানুষ এই অভিযানে সরাসরি হত্যার শিকার হয়। আরও লক্ষাধিক মারা যায় নির্যাতনে ও অনাহারে। ঝিনঝিয়াং-এ মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের পাইকারি হারে হত্যা ও বন্দী করা হয়েছিল। উইঘুর ও হুই মুসলিমদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়। মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়, কুরআন পোড়ানো হয়, আরবী শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি আজও সেই ধারাবাহিকতা চলছে। এখনও ৭-১০ লক্ষাধিক উইঘুরকে 'পুনঃশিক্ষা শিবিরে আটক রাখা হয়েছে' বলে তদন্তে উঠে এসেছে।[১৯]

কম্বোডিয়ায় ১৯৭৫-৭৯ সালে খেমাররুজ রেজিমের নেতৃত্বে পলপটের 'কৃষি সমাজবাদ' চার বছরে ১৫-২০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, যা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫%। পরিস্থিতি এমন ছিল যে চশমা পরা মানুষকেও 'বুদ্ধিজীবী'

১৪. *Jung Chang & Jon Halliday, Mao: The Unknown Story (London: Jonathan Cape, 2005), p. 456-460.*

১৫. *সালাহউদ্দীন, মৌলিক মানবাধিকার (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন; ২য় প্রকাশ : ২০০৭) পৃ. ৩০-৩৩।*

১৬. *R.J. Rummel, Death by Government: Genocide and Mass Murder Since 1900 (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1994), p. 4.*

১৭. *Anne Applebaum, Gulag: A History (New York: Doubleday, 2003), p. 578-580.*

১৮. *হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, পৃ. ৩০০-৩০১।*

১৯. *Andrew Walder & Yang Su, The Cultural Revolution in the Countryside: Scope, Timing and Human Impact (The China Quarterly, No. 173; March 2003), p. 74-99.*

বলে হত্যা করা হয়েছিল, শ্রেণীশত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে।[২০]

মার্কসবাদী এই রাষ্ট্রগুলো এত সহজে ও নির্মমভাবে নিজ দেশের মানুষকে হত্যা করতে পেরেছিল এই কারণে যে, তাদের কাছে মানুষের জীবন ছিল শ্রেণীস্বার্থের হাতিয়ার মাত্র। তাই যে কেউ শ্রেণীস্বার্থের বিরোধী হবে, সে-ই হ'ত নিধনযোগ্য। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় নৃশংসতার শিকার হয়ে বিশ্বজুড়ে নিহত হয়েছে ৯৪-৯৭ মিলিয়ন তথা প্রায় ১০ কোটি বনু আদম।[২১]

অবশেষে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী দেশগুলো একে একে তাদের আদর্শ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭৮ সালে চীন দেং শিয়াওপিংয়ের নেতৃত্বে বাজার অর্থনীতির দিকে ফিরে। আজ চীন নামে কমিউনিস্ট, কিন্তু কাজে পুঁজিবাদী। অনুরূপভাবে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন গর্বাচেভের গ্লাসনোস্ত ও পেরেস্ত্রোইকার (উন্মুক্ততা ও পুনর্গঠন) মাধ্যমে ভেঙে পড়ল। লিবিয়া, সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি যে সব মুসলিম রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের ধোঁকায় পড়েছিল, তারাও শেষ পর্যন্ত পতন ঠেকাতে পারেনি। এই ছিল মানবতার নামে প্রচারিত মার্কসীয় তত্ত্বের চূড়ান্ত পরিণতি।

শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম ও শাশ্বত ন্যায়বিচার নীতি :

মার্কস যে শোষণের নিগূঢ় ভাঙতে চেয়েছিলেন বিপ্লব দিয়ে, ইসলাম তা প্রতিরোধ করে চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক বিধান দিয়ে। এতে কোন রক্তপাত হয় না। আবার মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে হয় না। যেমন :

ক. সম্পদের সুষম বণ্টন :

সম্পদের ব্যাপারে ইসলামের সার্বজনীন নীতি হ'ল, সম্পদ কারো কাছে পুঞ্জীভূত থাকতে পারবে না। অবশ্যই তা উপৎপাদনশীল হ'তে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، 'যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যে কেবল ধনীদের হাতেই আবর্তিত না হয়' (হাশর ৭)।

ইসলামের যাকাত ব্যবস্থাপনা (২.৫%) সম্পদকে স্থির থাকতে দেয় না, বরং তা সমাজে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান *(নিসা ৪/১১-১২)* প্রতিটি প্রজন্মের সম্পদ বহু হাতে ভাগ করে দেয়। সূদ বা রিবা নিষেধের মাধ্যমে অলস পুঁজির অন্যায্য বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। আর ওয়াক্ফ সম্পদকে স্থায়ীভাবে জনকল্যাণে রূপান্তর করে। এভাবে ইসলাম সম্পদকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় চালিত করেছে, যা ব্যক্তির হাতে পুঁজিকে আটকে থাকতে দেয় না, আবার ব্যক্তির হাত থেকে নিয়ন্ত্রণও তুলে নেয় না। এই মধ্যপন্থার মাধ্যমে ইসলাম শাশ্বত কল্যাণের পথ দেখিয়েছে।

অন্যদিকে ইসলাম সবার জন্য সমান অর্থনৈতিক অবস্থানও চাপিয়ে দেয় না। কারণ সকল মানুষের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা সমান নয়। সুতরাং প্রত্যেকে তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী ফল পাবে এটাই স্বাভাবিক এবং সুষম বণ্টননীতি।[২২]

মূলত মার্কসের লক্ষ্য (শোষণমুক্তি) আর ইসলামের লক্ষ্য একই। কিন্তু ইসলামের দেখানো পথটি চিরন্তন ও মানবিক, কারণ এটিই মানুষের মানবীয় বৈশিষ্ট্য (ফিতরাত), যা মালিকানার অধিকারকে অস্বীকার না করে সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

খ. শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরী পরিশোধ কর'।[২৩] এই হাদীছটি কেবল একটি নির্দেশ নয়, বরং এমন চিরন্তন এক শ্রমনীতি, যা ক্বিয়ামত অবধি প্রাসঙ্গিক। বিলম্বে মজুরী পরিশোধকে ইসলাম শুধু অন্যায় নয়, সরাসরি যুলুম হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। রাসূল (ছাঃ) হাদীছে কুদসীতে আরও বলেছেন, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব... তার মধ্যে একজন হ'ল সেই ব্যক্তি যে শ্রমিক থেকে পূর্ণ কাজ নিয়েছে কিন্তু তার মজুরী দেয়নি'।[২৪]

মার্কস শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীসংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম সেই একই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নিয়েছে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহিতার ভয়কে। পার্থক্য হ'ল মার্কসের পথে রয়েছে শুধু ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংঘাত। আর ইসলামের দেখানো পথে রয়েছে সততা, ধৈর্য ও নৈতিক দায়িত্ববোধ।

গ. ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি :

মার্কস ব্যক্তিমালিকানাকে সমস্ত শোষণের মূল বলেছেন এবং তা সম্পূর্ণ বিলোপের দাবী করেছেন। এ ছিল এক হঠকারিতামূলক চরমপন্থা। মাওলানা আব্দুর রহীম এর বাস্তবতা উল্লেখ করে বলেছেন যে, ধনতন্ত্রে (পুঁজিবাদ) ব্যক্তিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমাজকে উপেক্ষা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রে সমষ্টির স্বার্থকে বড় করে দেখা হয়, যা করতে গিয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। ব্যক্তির কোন মূল্যই সেখানে স্বীকৃত নয়।[২৫] ইসলাম এই উভয় চরমপন্থার পরিবর্তে মধ্যমপন্থা অবলম্বন

২০. *Ben Kiernan, The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-1979 (New Haven: Yale University Press, 2008), p. 456-460.*

২১. *Stéphane Courtois et al., The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), p. 4.*

২২. *মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন; ২য় প্রকাশ : ১৯৯৮) পৃ. ৩৪০-৪৪।*

২৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৪৪৩, সনদ ছহীহ।*

২৪. *বুখারী হা/২২২৭।*

২৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, পৃ. ১৫।*

করেছে। একদিকে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার করেছে, অপরদিকে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর সামাজিক দায়বদ্ধতার শৃঙ্খলও পরিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا 'নির্বোধদের হাতে তোমাদের সম্পদ তুলে দিও না, যা আল্লাহ তোমাদের জীবনধারণের উপকরণ করেছেন' *(নিসা ৪/৫)*।

এই আয়াতে আল্লাহ 'তোমাদের সম্পদ' বলে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবার বলেছেন, 'আল্লাহ সম্পদকে তোমাদের জীবনধারণের উপকরণ করেছেন'। অর্থাৎ সম্পদের চূড়ান্ত মালিক আল্লাহ। আর মানুষ আমানতদার মাত্র।

এই দ্বৈত সত্যই ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের মর্মকথা। এভাবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ উভয় চরম থেকেই মুক্ত একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ।[২৬]

ঘ. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব :

মার্কস চেয়েছিলেন রাষ্ট্র হবে সম্পদের একচেটিয়া মালিক। কিন্তু ইসলাম বলে রাষ্ট্র সম্পদের মালিক নয়; বরং রক্ষক ও সুষম বণ্টনকারী। এই পার্থক্যটি মৌলিক। ইসলামী শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হ'ল পরকালের ভয় বা আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি। যেমন খলীফা ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ عَلَى شَطِّ الْفُرَاتِ ضَائِعَةً لَخَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللهُ عَنْهَا، 'যদি ফুরাত নদীর তীরে একটি বকরিও অযত্নে মারা যায়, তাহ'লে আমি ভয় পাই আল্লাহ আমাকে তার জন্য জিজ্ঞাসা করবেন'।[২৭] এই উক্তি কোন মার্কসবাদী শাসকের মুখ থেকে আসেনি। এসেছে সেই শাসকের কাছ থেকে যিনি জানতেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষের কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সামনে জবাব দিতে হবে। ধর্ম, বর্ণ বা বিশ্বাস নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, যা কোন অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফসল নয়, বরং তাওহীদভিত্তিক জবাবদিহিতার প্রায়োগিক রূপ।

ঙ. মানুষের সার্বজনীন মানবিক মর্যাদা সুরক্ষা :

মার্কসের সবচেয়ে বড় দার্শনিক ভুল ছিল, মানুষকে কেবল অর্থনৈতিক প্রাণী হিসাবে দেখা। তার তত্ত্বে মানুষ মূলত homo economicus, যা উৎপাদন করে, ভোগ করে আর শ্রেণীস্বার্থে লড়াই করে। তার নৈতিকতা, ধর্মবোধ, ভালোবাসা, আত্মত্যাগ এ সবকিছুই অর্থনৈতিক সম্পর্কের ছায়া মাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু ইসলামবিরোধী নয়, বিজ্ঞানসম্মতও নয়।

আব্রাহাম মাসলো তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মানুষের চাহিদা পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত। এর মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান সবচেয়ে নিম্নস্তর মাত্র। উপরের স্তরে রয়েছে নিরাপত্তা, সম্পর্ক, আত্মমর্যাদা এবং সর্বোচ্চে রয়েছে self-actualization তথা নিজের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা উপলব্ধির চাহিদা। মার্কস কেবল প্রথম স্তরকে সব মনে করেছেন, মাসলো দেখিয়েছেন এটি শুরুমাত্র।[২৮] অন্যদিকে নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দী মনোবিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল তাঁর Man's Search for Meaning (১৯৪৬) গ্রন্থে লিখেছেন যে, যে মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পায়, সে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিও সহ্য করতে পারে। জীবনের অর্থহীনতা মানুষকে শারীরিক কষ্টের চেয়ে বেশী ভেঙে দেয়।[২৯]

মানুষ কেবল অন্যান্য পশুর মত বস্তুগত চাহিদার দাস নয়, বরং সে এক ভাবাবেগসম্পন্ন বুদ্ধিমান প্রাণী, যে পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা। ইসলাম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে চৌদ্দশত বছর আগেই। ইসলামী আদর্শে অর্থনৈতিক বিষয়ের পরিবর্তে নৈতিক মূল্যবোধকেই জীবনের মৌলিক বিষয় মনে করা হয়।[৩০]

এজন্য ইসলাম বলেছে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র খলীফা। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، 'স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি' *(বাক্বারাহ ২/৩০)*।

এই একটি আয়াত মার্কসের মানব-দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে চ্যালেঞ্জ করে। মার্কসের মতে, মানুষ হ'ল স্রেফ উৎপাদন-সম্পর্কের ফলাফল এবং ইতিহাসের বস্তুগত পণ্য। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং পৃথিবীতে তাঁর আমানতের বাহক। এই একটি দর্শনের মধ্যে রয়েছে মানুষের মর্যাদা, দায়িত্ব এবং স্বাধীনতা, তিনটি একসাথে।

মার্কস মানুষকে শ্রেণীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন আর ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বানিয়েছে। এই দুই বিশ্বদৃষ্টির পার্থক্যই নির্ধারণ করে দেয় যে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে দু'টো ব্যবস্থার গতিপথ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 'আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি, তাদের স্থলে ও জলে বহন করেছি, তাদের উত্তম জীবিকা দিয়েছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭০)*।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ মানুষকে 'বনু আদম' হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র

২৬. *M. Umar Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), pp. 202-215.*
২৭. *হিলইয়াতুল আওলিয়া, পৃ. ১/৫৩।*
২৮. *Abraham Maslow, A Theory of Human Motivation (Psychological Review, 1943 : Vol. 50, No. 4), p. 370-396.*
২৯. *Boston: Beacon Press, 1959; p. 104-105.*
৩০. *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, পৃ. ১৮৯-৯০।*

মানবজাতিই আল্লাহর কাছে মর্যাদাসম্পন্ন। এটি মানব-মর্যাদার সবচেয়ে সার্বজনীন ঘোষণা যা ইতিহাস দেখেছে। অন্যদিকে মার্কসের দর্শনে মানুষের মর্যাদা শ্রেণীনির্ভর। অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী মর্যাদা পাবে, তবে বিপ্লবের পর। অথচ ইসলামে মানুষের মর্যাদা সৃষ্টিগতই। জন্মের সাথেই প্রতিটি মানুষ মর্যাদাসম্পন্ন। তার জন্য কোন বিপ্লব বা রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের দরকার হয় না।

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টির উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ‘অতঃপর যখন আমি তাকে পূর্ণরূপ দেব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেও’ *(হিজর ১৫/২৯)*। এখানে আল্লাহ বলেছেন, ‘আমার রূহ থেকে’। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা গভীরভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত। এই রূহই মানুষকে পশুর চেয়ে আলাদা করে। মার্কস মানুষকে এমন এক উন্নত পশু বানিয়েছেন, যে হ’ল আর্থিক চাহিদার দাস। আর ইসলাম বলছে, মানুষের মধ্যে এমন একটি সত্তা আছে, যা কেবল আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গিয়েই পূর্ণতা পায়। এই কারণেই আল্লাহ বলেছেন, أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ‘জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়’ *(রাদ ১৩/২৮)*।

মার্কস মনে করেছিলেন অর্থনৈতিক মুক্তিই মানুষের চূড়ান্ত মুক্তি। কিন্তু সোভিয়েত সমাজে অর্থনৈতিক ‘সাম্য’ আনার পরেও মানুষ মদ্যপান, বিষণ্নতা ও আত্মহত্যায় বিশ্বের শীর্ষে চলে গেল। কারণ সব চাহিদা পূরণ হ’লেও তার রূহের তৃষ্ণা পূরণ হয়নি।

রাসূল (ছা.) বলেছেন, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ‘প্রতিটি শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে’।[৩১] এই ফিতরাত হ’ল মানুষের স্বাভাবিক সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, যেখানে সত্যের প্রতি আকর্ষণ, ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহকে জানার স্বাভাবিক তাড়না রয়েছে। মার্কস বলেছেন, মানুষের নৈতিকতা, সে যে শ্রেণীর তা-ই নির্ধারণ করে। আর ইসলাম বলছে মানুষের নৈতিকতা শ্রেণীর আগে থেকেই বিদ্যমান। এই নৈতিক বৈশিষ্ট্যই তাকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে টানে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ ডোনাল্ড ব্রাউন Human Universals (১৯৯১) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিতে কিছু নৈতিক সার্বজনীনতা (moral universals) বিদ্যমান। যেমন ন্যায়বিচারের ধারণা, পারিবারিক বন্ধন, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি।[৩২] এগুলো কোন অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফল নয়; বরং এর নামই ফিতরাত।

মার্কস বলেছিলেন, পুঁজিবাদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই বিচ্ছিন্নতার নিরাময় তিনি খুঁজেছিলেন শ্রেণীহীন সমাজে। অপরদিকে ইসলাম এই একই বিচ্ছিন্নতার গভীরতর কারণ চিহ্নিত করেছে, আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্নতা। যখন মানুষ জানে তার একজন স্রষ্টা রয়েছে এবং প্রতিটি মানুষই বনু আদম হিসাবে সম্মানিত, তখন সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে না, সে তখন অন্যকে শ্রেণীর শত্রু নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে দেখে। ফলে মানুষে মানুষে বিরোধ কমে যায় এবং বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হয়।

চ. তাওহীদই হ’ল ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত ভিত্তি :

মার্কসের তত্ত্বে ন্যায়বিচারের কোন পরম ভিত্তি নেই। দিন শেষে যে কোন ব্যাপারে ন্যায় ও অন্যায় নির্ধারিত হয় শ্রেণীস্বার্থ দিয়ে। তাহ’লে প্রশ্ন ওঠে, কোন মানদণ্ডে বলা যাবে যে, অর্থনৈতিক শোষণ ‘অন্যায়’? মার্কসের নিজের বস্তুবাদী নিয়মেই এই প্রশ্নের উত্তর নেই।

ইসলাম এই শূন্যতা পূরণ করে তাওহীদ দিয়ে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার ও আত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন’। এখানে ‘আদল’ (ন্যায়বিচার) ও ‘ইহসান’ (সদাচার) নীতি দু’টির সমন্বয়ে ইসলামের সামাজিক আদর্শ গঠিত হয়। তাছাড়া মার্কসের ন্যায়বিচার শ্রেণীনির্ভর, তাই পরিবর্তনশীল। কিন্তু ইসলামের ন্যায়বিচার আল্লাহ-নির্ধারিত, তাই শাশ্বত। এর কোন পরিবর্তন নেই। সর্বযুগেই এটি বাস্তব। এটাই দু’টো ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক পার্থক্য।

উপসংহার :

মার্কস মানুষে মানুষে শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ জাগিয়েছিলেন, তা অন্যায্য ছিল না। কিন্তু সমস্যার সমাধানে তার ধর্মহীন রাষ্ট্র, ব্যক্তি-মালিকানার বিলোপ কিংবা শ্রেণীসংগ্রামের দর্শন বাস্তবে আগমন করেছে এক নয়া স্বৈরতন্ত্রের রূপ নিয়ে। ইসলাম একই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, কিন্তু মানুষের ফিতরাত তথা স্বাভাবিক সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা এবং তার স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখে। ইসলাম এনেছে যাকাত, উত্তরাধিকার, ওয়াকফের মত শাশ্বত বিধান। সেই সাথে সূদের মত যুলুমকে প্রতিরোধ করে শ্রমিকের পূর্ণ অধিকার রক্ষার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেছে। ইসলামের এই ন্যায়বিচারের মূল ভিত্তি হ’ল তাওহীদ, যে বিশ্বাস মানুষকে কোন রাষ্ট্র, দল বা শ্রেণীর কাছে মাথা নত করায় না। বরং সে মাথা নত করে সরাসরি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে। তাঁর প্রেরিত বিধানের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে চির মুক্তি ও সফলতার সনদ। সুতরাং এটাই ধ্রুব সত্য যে, মার্কস পুজিবাদের যে সমস্যাটি ধারণ করেছেন, সেই সমস্যার সমাধানে বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র নয়, ইসলামই একমাত্র স্থায়ী ও মানবিক ব্যবস্থা। মানবজাতির প্রকৃত মুক্তির জন্য যে মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান প্রয়োজন, তা একমাত্র ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতেই বিদ্যমান।

---

৩১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৯০।*
৩২. *Donald E. Brown, Human Universals (Philadelphia: Temple University Press, 1991), p. 130-141.*

আহলে বায়ত : পরিচয় ও মর্যাদা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

ভূমিকা :

ইসলামের ইতিহাসে নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ বা 'আহলে বায়ত-এর মর্যাদা ও সম্মান এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে এই পবিত্র বংশধারার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাঁদের প্রতি সামান্যতম বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমান ধ্বংস ও জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম কারণ। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁদের নিষ্কলুষ পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় উম্মতকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার্থে পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি তাঁর আহলে বায়তকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার এবং তাঁদের অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়ার জোর তাকীদ দিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আহলে বায়তের প্রকৃত মর্যাদা, তাঁদের অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁদের সুনির্দিষ্ট অধিকার এবং তাঁদের প্রতি উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

আহলে বায়তের পরিচয় :

আহলুল বায়ত (أَهْلُ ٱلْبَيْتِ) একটি আরবী শব্দবন্ধ। 'আহল' (أهل) অর্থ পরিবার বা সদস্য এবং ও বায়ত (بيت) অর্থ ঘর। শাব্দিক অর্থে 'আহলে বায়ত' বলতে ঘরে বসবাসকারী আপনজন বা পরবিাররে সদস্যদরে বোঝায়। পারিভাষিক অর্থে 'আহলে বায়েত' বলতে মূলত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মানিত পরিবারবর্গকে বোঝানো হয়। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ও সুন্নাহ্‌র আলোকে আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত হ'লেন-

১. নবী পত্নীগণ : এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، 'হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। উক্ত আয়াত অনুযায়ী তাঁরা আহলে বায়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মোট ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত খাদীজা ও যয়নব বিনতে খুযায়মা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। বাকী ৯ জন স্ত্রী রেখে তিনি মারা যান। যারা হ'লেন যথাক্রমে হযরত সাওদা, আয়েশা, হাফছাহ, উম্মে সালামাহ, যয়নব বিনতে জাহশ, জুওয়াইরিয়াহ, উম্মে হাবীবাহ, ছাফিইয়াহ ও মায়মূনা বিনতুল হারেছ (রাঃ)। এতদ্ব্যতীত আরও দু'জন মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সহবাসের পূর্বেই তারা পরিত্যক্ত হন। প্রথমজন আসমা বিনতে নু'মান আল-কিনদিয়াহ। যিনি 'জাউনিয়াহ' (الْجَوْنِيَّةُ) বলেও পরিচিত।[১] তাকে কিছু মাল-সম্পদ দিয়ে বিদায় করা হয়। দ্বিতীয়জন 'আমরাহ বিনতে ইয়াযীদ আল-কিলাবিয়াহ।[২]

২. ফাতেমা, আলী, হাসান, হোসাইন (রাঃ) : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকালে বের হ'লেন। তার পরনে ছিল কালো নকশাবৃত একটি পশমী চাদর। হাসান ইবনু আলী (রাঃ) এলেন, তিনি তাকে চাদরের ভেতর প্রবেশ করিয়ে নিলেন। হোসাইন ইবনু আলী (রাঃ) এলেন, তিনিও চাদরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। ফাতেমা (রাঃ) এলেন, তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন। তারপর 'আলী (রাঃ) এলেন তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপরে বললেন, 'হে আহলে বায়ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হ'তে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করে তোমাদের পবিত্র করতে চান' *(আহযাব ৩৩/৩০)*।[৩]

৩. যাদের উপর ছাদাক্বা হারাম : আহলে বায়ত বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের উপর চিরদিন ছাদাক্বা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তাঁরা হ'লেন বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব অথবা কেবল বনু হাশেম, কিংবা বনু হাশেম এবং তাঁদের ঊর্ধ্বমুখী বংশধারা গালিব ইবনে ফিহর পর্যন্ত। অধিকাংশ আলেম ও গবেষক এই মতামতকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনু কাছীর (রহ.) বলেন, আহলে বায়ত বলতে কেবল নবীপত্নীগণ নয় বরং তাঁর পরিবারগণও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটিই এ বিষয়ে বর্ণিত কুরআন ও হাদীছসমূহকে শামিল করে'।[৪]

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিয়েছিলেন। সেই খুৎবায় তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর বললেন, وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 'আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তখন (হোসাইন (নামক এক ব্যক্তি) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে যায়েদ! তাঁর আহলে বায়ত কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি তাঁর আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত নন? যায়েদ (রাঃ) বললেন, তাঁর স্ত্রীগণও তাঁর আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাঁর আহলে বায়ত হ'লেন তাঁরা যাদের জন্য তাঁর ওফাতের পর ছাদাকা গ্রহণ করা হারাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কারা? যায়েদ (রাঃ) বললেন, তাঁরা হ'লেন আলী (রাঃ)-এর পরিবার, আক্বীলের পরিবার, জা'ফরের পরিবার এবং আব্বাসের পরিবার। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাদের সবার জন্যই কি ছাদাক্বা হারাম? যায়েদ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ।[৫]

উল্লেখ্য, যারা নবী পরিবারের মুক্তদাস ছিলেন তারাও আহলে বায়তের অর্ন্তভুক্ত। মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের (মাওয়ালী) ব্যাপারে

** সিনিয়র শিক্ষক, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।*

১. ফাৎহুল বারী হা/৫২৫৫-এর ব্যাখ্যা।

২. বুখারী হা/৫২৫৪-৫৫; ইবনু হিশাম ২/৬৪৭, গৃহীত : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ, পৃ.৭৫৯।

৩. মুসলিম হা/২৪২৪।

৪. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৬০ পৃ.।

৫. মুসলিম হা/২৪০৮।

যে হাদীছটি মেহরান থেকে বর্ণিত হয়েছে সেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমরা মুহাম্মাদের পরিবার (আল-মুহাম্মাদ), আমাদের জন্য ছাদাক্বা হালাল নয়; আর কোন কওমের মুক্তিপ্রাপ্ত দাসও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত'।[৬] অতএব, নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন হ'লেন তাঁর সম্মানিত স্ত্রীগণ, তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ, বনু হাশেম, বনু মুত্তালিব এবং তাদের মুক্তদাসগণ।

আহলে বায়তের মর্যাদা

১. আহলে বায়তের পবিত্রতা ঘোষণা :

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নবী পরিবারের (আহলে বায়েত) পবিত্রতা ঘোষণা করে বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، 'হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। এর তাফসীরে ইবনু আতিয়্যা (রহ.) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত الرِّجْسُ 'রিজস' শব্দটি পাপ, শাস্তি, অপবিত্রতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, যা আল্লাহ তা'আলা আহলে বায়ত থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, ইবনে হাজার আল-হায়তামী (রহ.)-এর মতে, এই আয়াতটি নবী পরিবারের অনন্য ফযীলত ও মর্যাদার মূল উৎস। কারণ আয়াতটি إِنَّمَا (নিশ্চয়ই) শব্দ দ্বারা শুরু হয়ে কেবল তাঁদের ব্যাপারেই মহান আল্লাহ্র পবিত্র করার ইচ্ছাকে নির্দিষ্ট করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হ'ল তাঁদেরকে যাবতীয় পাপ, ঈমানের ক্ষেত্রে সংশয় এবং সকল প্রকার নিন্দনীয় চরিত্র ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখা।[৭]

২. নবী পরিবারের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরা তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর' *(আহযাব ৩৩/৫৬)*। কা'ব ইবনে উজরাহ (রাঃ) বলেন, 'যখন উক্ত আয়াতটি নাযিল হ'ল তখন এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি সালাম জানানোর নিয়ম তো আমরা জানলাম, কিন্তু আপনার প্রতি ছালাত (দরূদ) পাঠের নিয়ম কি? তিনি বললেন, 'তোমরা বল, 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ' (হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের ওপর ছালাত বা রহমত বর্ষণ করুন...'।[৮] এর মধ্যেই আহলে বায়ত বা নবী পরিবারের জন্য এক মহান মর্যাদা ও ফযীলত নিহিত রয়েছে। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর পরিবারের ওপরও ছালাত (দরূদ) পাঠ করার জন্য উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, ভৌগোলিক সময়ের পার্থক্যের কারণে আযান, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত এবং মুমিনদের ব্যক্তিগত ইবাদতের মাধ্যমে দিবারাত্রির ২৪ ঘণ্টা বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে অবিরত রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি এই দরূদ ও সালাম উচ্চারিত হচ্ছে। সুবহানাআল্লাহ।

৩. মুবাহালার আয়াতে নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্তি :

ইসলামী ইতিহাসের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল 'মুবাহালা' বা সত্য প্রতিষ্ঠায় মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বা অভিশাপ কামনা করা। নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথে ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে বিতর্কের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন সত্যের প্রমাণের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করার নির্দেশ আসে, তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বস্ত মানুষদেরই এই ঐতিহাসিক পরীক্ষার জন্য বেছে নেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، 'অনন্তর তোমার নিকট নিশ্চিত জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও যদি তারা ঈসা সম্পর্কে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে তুমি বল, এসো আমরা ডাকি আমাদের ও তোমাদের সন্তানদের, স্ত্রীদের ও নিজেদের। অতঃপর সকলে আল্লাহ্র নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি এই মর্মে যে, মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক' *(আলে ইমরান ৩/৬১)*। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হ'ল... তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইনকে ডাকলেন। অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার'।[৯] সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে নবী পরিবারের এই অন্তর্ভুক্তি তাঁদের অসামান্য মর্যাদাকেই প্রমাণ করে।

৪. নবী (ছাঃ) ও তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠত্ব :

পৃথিবীতে যুগে যুগে মহান আল্লাহ তাঁর বার্তা পৌঁছানোর জন্য সর্বোত্তম মানুষদের মনোনীত করেছেন। শুধু ব্যক্তি হিসাবেই নয়, বংশ ও পারিবারিক আভিজাত্যের দিক থেকেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবার সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র বংশধারাকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করে ধাপে ধাপে উৎকর্ষের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، 'নিশ্চয়ই

৬. *বুখারী হা/৬৭৬১; মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৪৪৬, সনদ ছহীহ।*
৭. *আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকা: ২/৪২৫।*
৮. *ত্বাহাবী, মুশকিলুল আছার হা/২২৩১।*
৯. *মুসলিম হা/২৪০৪।*

আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে কিনানাহ গোত্রকে মনোনীত করেছেন, কিনানাহ থেকে কুরাইশ বংশকে মনোনীত করেছেন, কুরাইশ থেকে বনু হাশিম-কে মনোনীত করেছেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন'।[১০]

নবী করীম (ছাঃ)-এর এই বংশগত মর্যাদার বিষয়টি এতটাই ঊর্ধ্বে যে, একবার কিছু মানুষের মাঝে এ নিয়ে কথা উঠলে তিনি সরাসরি মিম্বরে আরোহণ করে এর জবাব দেন। মুত্তালিব ইবনে আবি ওয়া'দায়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে মানুষের কিছু কথাবার্তা (বংশ মর্যাদা নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য) পৌঁছাল। তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তারা বললেন, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি বললেন, 'আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে তাদের সর্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে দু'টি দলে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারপর তিনি পরিবারসমূহ (ঘরসমূহ) তৈরি করেছেন এবং আমাকে তাদের সর্বোত্তম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব আমি পারিবারিক দিক থেকেও তোমাদের চেয়ে সর্বোত্তম এবং ব্যক্তিগত সত্তার দিক থেকেও তোমাদের চেয়ে সর্বোত্তম'।[১১]

উম্মতকে কুরআন ও আহলে বায়তকে আঁকড়ে ধরার তাকীদ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের হেদায়াত ও মুক্তির ব্যাপারে কতটা চিন্তাশীল ছিলেন, তা জীবনের অন্তিম মুহূর্তের উপদেশগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি পৃথিবীতে চিরকাল থাকবেন না, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে উম্মত যেন কখনো পথভ্রষ্ট না হয় সেজন্য তিনি নাজাতের দু'টি অবিচ্ছেদ্য আলোকবর্তিকা রেখে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জেনে রেখো, হে লোকসকল! আমি তো কেবল একজন মানুষ। শীঘ্রই আমার প্রতিপালকের দূত (মৃত্যুর ফেরেশতা) আমার কাছে আসবেন এবং আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেব। وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ " فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ. قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 'আর আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু রেখে যাচ্ছি। তার প্রথমটি হ'ল মহান আল্লাহ্র কিতাব; এতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কিতাবকে আঁকড়ে ধরো এবং এর উপর শক্তভাবে অবিচল থাকো। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি (অনুসরণের) উৎসাহ দিলেন এবং এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করলেন। এরপর তিনি বললেন, আর (দ্বিতীয় বস্তুটি হ'ল) আমার আহলে বায়ত (পরিবার)। আমি আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি'।[১২] উম্মতের দিকনির্দেশনার এই বার্তাটি তিনি বিদায় হজ্জেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি, যা তোমরা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না; তা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার পরিবার বা আহলে বায়েত'।[১৩]

ছালাতের দরূদে নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্তি :

মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য ইবাদত হ'ল নবী কারীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এটি। তবে ইসলামী শরী'আতে এই দরূদ পাঠের ক্ষেত্রে কেবল রাসূল (ছাঃ)-কে স্মরণ করাই শেষ কথা নয়, বরং তাঁর পরিবার অর্থাৎ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ ও পবিত্র বংশধরদেরও এই দো'আয় অন্তর্ভুক্ত করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম যখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে দরূদ পড়ার তাকীদ পেলেন, তখন তাঁরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে আপনার প্রতি ছালাত (দরূদ) পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেন, 'তোমরা বল, আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা; ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা, ফিল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর বংশধরদের ওপর ছালাত (রহমত) বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ছালাত বর্ষণ করেছিলেন ইবরাহীমের ওপর। আর আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর বংশধরদের ওপর, যেরূপ আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের পরিবারের ওপর সারা জাহানের মধ্যে; নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত'।[১৪]

আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা ও তার প্রতি ভালোবাসা :

আহলে বায়তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা এক অতুলনীয় উচ্চতায় আসীন। তাঁর প্রতি ভালোবাসা একজন মুমিনের ঈমানের প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং তাঁকে যে অসামান্য স্বীকৃতি

১০. *ছহীহ মুসলিম হা/২২৭৬; মিশকাত হা/৫৭৪০।*
১১. *আহমাদ হা/১৭৮৮, সনদ হাসান।*
১২. *মুসলিম হা/২৪০৮; আহমাদ হা/১৯২৮৫।*
১৩. *তিরমিযী হা/৩৭৮৬; মিশকাত হা/৬১৪৩।*
১৪. *বুখারী হা/৩৩৬৯; মিশকাত হা/৯২০।*

দিয়েছেন, তা 'গাদীরে খুম'-এর ঐতিহাসিক ভাষণে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাহাবাহ নামক স্থানে আলী (রাঃ)-কে উপস্থিত থাকতে দেখেছি, যখন তিনি উপস্থিত লোকজনকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে আহ্বান জানিয়ে বলছিলেন, 'আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করছি, যে ব্যক্তি গাদীরে খুমের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছে যে, 'আমি যার মাওলা (অভিভাবক), আলীও তার মাওলা; সে যেন দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয়। আব্দুর রহমান বলেন, তখন বারোজন বদরী ছাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি যেন এখনো তাঁদের একজনের দিকে তাকিয়ে আছি! অতঃপর তাঁরা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা গাদীরে খুমের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি কি মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক প্রিয় বা নিকটবর্তী নই? আমার স্ত্রীগণ কি তাদের মাতা নন? আমরা আরয করলাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন, অতএব, আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসে, আপনিও তাকে ভালোবাসুন; আর যে আলীর সাথে শত্রুতা করে, আপনিও তার সাথে শত্রুতা করুন।[১৫]

আলী (রাঃ)-এর প্রতি এই ভালোবাসাকে স্বয়ং নবী কারীম (ছাঃ) মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্যকারী হিসাবে নির্ধারণ করে গেছেন। যির্র ইবনু হুবাইশ (রহঃ) বলেন, আলী (রাঃ) বলেছেন, وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، 'সেই সত্তার কসম, যিনি শস্যদানা অংকুরিত করেছেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেছেন! নিশ্চয়ই উম্মী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমার প্রতি এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, কোন মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমাকে ভালোবাসবে না এবং কোন মুনাফিক ছাড়া কেউ আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না'।[১৬]

ফাতেমা (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব :

আহলে বায়তের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদরের কন্যা ফাতেমা (রাঃ)। নারী জাতির জন্য দুনিয়াতে তিনি কেবল এক অনন্য আদর্শই নন, বরং পরকালীন জীবনে তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী। তাঁর এই অসামান্য শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত গর্বের সাথে ব্যক্ত করেছেন। জান্নাতবাসী নারীদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠদের একজন। যেমন উরওয়াহ (রহঃ) বলেন, 'আয়েশা (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে বললেন, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দেব না যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ: مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ، وَخَدِيجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدٍ، وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِمِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، 'জান্নাতবাসী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চারজন হ'লেন ইমরানের কন্যা মারিয়াম, আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা ফাতেমা, খুওয়াইলিদের কন্যা খাদীজা এবং ফেরাউনের স্ত্রী মুজাহিমের কন্যা আসিয়া'।[১৭] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে ফাতেমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি মুমিন নারীদের নেত্রী অথবা এই উম্মতের নারীদের নেত্রী হবে?'[১৮] এই হাদীছগুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ফাতেমা (রাঃ) কেবল নবী পরিবারেরই অহংকার নন, বরং তিনি সারা বিশ্বের মুমিন নারীদের জন্য পরকালীন জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের এক অনন্য প্রতীক।

ফাতেমা (রাঃ)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভালোবাসা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হৃদয়ে তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-এর জন্য অসীম স্নেহ ও ভালোবাসা ছিল। মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِى وفِي روية فَإِنَّمَا هِىَ بَضْعَةٌ مِنِّى، يُرِيبُنِى مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِى مَا آذَاهَا، 'ফাতেমা (রাঃ) আমারই একটি অংশ। অতএব যে তাকে রাগান্বিত করল, সে যেন আমাকেই রাগান্বিত করল। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'নিশ্চয়ই সে (ফাতেমা) আমারই একটি অংশ। যা তাকে সংশয় বা উদ্বেগে ফেলে, তা আমাকেও উদ্বেগে ফেলে এবং যা তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়'।[১৯] আলী (রাঃ) আবু জাহলের মেয়েকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করলে রাসূল (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে বলেন, 'আর নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা আমারই একটি অংশ। যা কিছু তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর (আবু জাহলের) কন্যা কখনো একজন পুরুষের অধীনে একসাথে একত্রিত হ'তে পারে না। নবী করীম (ছাঃ)-এর এই অসন্তুষ্টির কথা শুনে আলী (রাঃ) বিয়ের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিলেন।[২০]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ওঠাবসা, আচার-আচরণ, চালচলন এবং স্বভাব-চরিত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা ফাতেমার চেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে আমি দেখিনি। ফাতেমা (রাঃ) যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসতেন, তখন নবীজী (ছাঃ) নিজে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার জায়গায় তাঁকে বসাতেন। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) যখন ফাতেমার ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন ফাতেমাও নিজের বসার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার জায়গায় তাঁকে বসাতেন।[২১] কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-এর প্রতি নবী কারীম (ছাঃ)-

১৫. *আহমাদ হা/৯৬১; মিশকাত হা/৬০৯৪; সনদ ছহীহ।*
১৬. *মুসলিম হা/৭৮; মিশকাত হা/৬০৭৯।*
১৭. *হাকেম হা/৪৮৫৩; ছহীহাহ হা/১৪২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৭৮।*
১৮. *বুখারী হা/২৬; মুসলিম হা/২৪৫০।*
১৯. *বুখারী হা/৫২৩০; মিশকাত হা/৬১৩০।*
২০. *মুসলিম হা/২৪৪৯।*
২১. *আবুদাউদ হা/৫২১৭; মিশকাত হা/৪৬৮৯, সনদ ছহীহ।*

এর এই অবিমিশ্র ভালোবাসা প্রমাণ করে যে, আহলে বায়তের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আত্মার সম্পর্ক কতটা নিবিড় ছিল।

হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-এর মর্যাদা :

দৌহিত্র–হাসান ও হোসাইন (রাঃ) হ'লেন নবী পরিবারের দু'টি প্রস্ফুটিত গোলাপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র। স্বয়ং নবী কারীম (ছাঃ) তাঁদেরকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন এবং উম্মতকেও তাঁদেরকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের পরকালীন শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে তিনি বলেছেন, الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، 'হাসান ও হোসাইন হ'ল জান্নাতবাসী যুবকদের নেতা'।[২২] একদিন নবী করীম (ছাঃ) মদীনার এক বাজার থেকে ফিরে তিনবার বললেন, 'লুকাই (ছোট্ট বালক) কোথায়? হাসান ইবনু আলীকে ডাকো। এরপর হাসান ইবনু আলী (রাঃ) হেঁটে এলেন, আর তাঁর গলায় ছিল একটি হার। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁর হাত দিয়ে এভাবে (ইশারা) করলেন, আর হাসানও তাঁর হাত দিয়ে এভাবে করলেন। এরপর তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো এবং যে তাকে ভালোবাসে তাকেও তুমি ভালোবাসো'।[২৩]

ইরাকবাসীদের এক ব্যক্তি ইবনে ওমর (রাঃ)-কে মশার রক্ত কাপড়ে লাগার (হুকুম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা এই ব্যক্তির দিকে তাকাও! সে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দৌহিত্র হোসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করেছে! অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই হাসান এবং হোসাইন এই দু'জন দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল'।[২৪] এছাড়া হাসান (রাঃ)-এর দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) আগেই সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার এই পুত্র একজন নেতা। আশা করি, আল্লাহ এর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন'।[২৫]

আহলে বায়তের প্রতি আবুবকর (রাঃ)-এর ভালোবাসা :

আহলে বায়তের প্রতি ছাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা কতটা গভীর ছিল, তা ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর ঐতিহাসিক বাণী ও আমল থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। উম্মতকে নবীজির পরিবারের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন, ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فِى أَهْلِ بَيْتِهِ، 'তোমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর পরিবারের মাঝে খোঁজ করো'।[২৬] তিনি আরো বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও তাদের হক আদায় করা আমার নিকট আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেয়েও অধিক প্রিয়'।[২৭]

আহলে বায়তের প্রতি ওমর (রাঃ)-এর ভালোবাসা :

আহলে বায়তের সাথে ওমর (রাঃ)-এর গভীর সুসম্পর্ক ছিল এবং তিনি তাঁদের স্নেহ ও সম্মান করতেন। এর প্রমাণস্বরূপ দেখা যায়, আলী (রাঃ) তাঁর মেয়ে উম্মে কুলসুমের বিয়ে ওমর (রাঃ)-এর সাথে দিয়েছিলেন।[২৮] আহলে বায়তের প্রতি তাঁর সম্মানের মাত্রা এমন ছিল যে, যেখানে তাঁর নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর সর্বদা তাঁর কাছে প্রবেশের সুযোগ পেতেন না, সেখানে হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি ছিল।[২৯] এছাড়া তিনি আহলে বায়তের সদস্যদের সম্মানার্থে তাঁদের জন্য বিশেষ ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন এবং ইরাক ও শাম বিজয়ের পর প্রাপ্ত গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ তিনি সর্বপ্রথম আহলে বায়তের সদস্যদের হাতেই তুলে দেন।[৩০] এমনকি পারস্য সম্রাটের মেয়ে যুদ্ধবন্দি হয়ে ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপহার হিসাবে পাঠানো হলে, তিনি তাঁকে নিজে গ্রহণ না করে হোসাইন (রাঃ)-কে প্রদান করেন।[৩১]

আহলে বায়তের প্রতি বিদ্বেষের পরিণতি :

নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা যেমন ঈমানের অংশ, তেমনি তাঁদের প্রতি সামান্যতম বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ করা ঈমান ধ্বংসের অন্যতম কারণ। নবী পরিবারের প্রতি বিদ্বেষকে অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النار، 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে কোন ব্যক্তিই আমাদের আহলে বায়ত (পরিবার)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৩২] এছাড়া আলী (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে নবীজি (ছাঃ) সরাসরি মুনাফিকের লক্ষণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৩] আহলে বায়তের প্রতি এই বিদ্বেষের পরিণতি সম্পর্কে ইমাম আল-মুনাভী (রহ.) বলেন, 'তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ বা ক্ষোভ পোষণ করা জাহান্নামকে অবধারিত করে দেয়'।[৩৪]

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার আশা করে অথচ জান্নাতের যুবকদের নেতা হাসান ও হোসাইন (রাঃ) কিংবা

২২. *তিরমিযী হা/৩৭৬৮; মিশকাত হা/৬১৫৪।*
২৩. *বুখারী হা/৫৮৮৪; মিশকাত হা/৬১৩৪।*
২৪. *বুখারী হা/৩৭৫৩; ছহীহুল জামে' হা/১৬০০।*
২৫. *বুখারী হা/৩৬২৯; মিশকাত হা/৬১৩৫।*
২৬. *বুখারী হা/৩৭১৩।*
২৭. *বুখারী হা/৩৭১২; মুসলিম হা/১৭৫৯।*
২৮. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৫০১।*
২৯. *শরহু নাহযিল বালাগাহ ৩/১১০।*
৩০. *তারীখুল ইয়াকুবী পৃ. ১৬৬; ইবনু আম্বাহ, উমদাতু-ত্বালেব, পৃ.১৯২।*
৩১. *মির্যা তাকী খান, নাসিখুত তাওয়ারিখ ৩/১০।*
৩২. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯৭৮; ছহীহাহ হা/২৪৮৮।*
৩৩. *মুসলিম হা/৭৮; মিশকাত হা/৬০৭৯।*
৩৪. *ফায়যুল কাদীর ২/৫১৯।*

জান্নাতী নারীদের নেত্রী ফাতেমা (রাঃ)-এর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে, তার জান্নাতের আশা করাটাই অবান্তর। নবী পরিবারের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করার কারণে এই শ্রেণীর মানুষেরা কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, বরং এটি তাদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

আহলে বায়তের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

ছাদাক্বাহ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা :

ইসলামী শরী'আতে আহলে বায়তের পবিত্রতা ও অনন্য মর্যাদা রক্ষার্থে তাঁদের জন্য মানুষের যাকাত গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। যাকাতকে মূলত মানুষের সম্পদের ময়লা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা এই পবিত্র বংশধারার মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، 'নিশ্চয়ই এই ছাদাক্বা (যাকাত) হ'ল মানুষের সম্পদের) ময়লা-আবর্জনা। আর এটি মুহাম্মদের জন্য এবং মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনের (আহলে বায়তের) জন্য হালাল নয়'।[৩৫] নবীজি (ছাঃ) নিজে এই ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কখনো (রাস্তায়) পড়ে থাকা খেজুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেটি তুলে নিয়ে খাওয়া থেকে কেবল এই ভয়েই বিরত থাকতেন যে তা ছাদাক্বার খেজুর হ'তে পারে।[৩৬] একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর পার্শ্বদেশে একটি খেজুর পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি সেটি নিয়ে খেয়ে ফেললেন। অতঃপর রাতের শেষভাগে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। এতে তাঁর কোন কোন স্ত্রী অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আমি আমার পার্শ্বদেশে একটি খেজুর পেয়েছিলাম এবং তা খেয়ে ফেলেছিলাম। এখন আমি এই আশঙ্কায় (অস্বস্তি বোধ) করছি যে, তা ছাদাক্বার খেজুর ছিল না তো!'।[৩৭]

পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতিও তাঁর এই কঠোর সতর্কতা বিদ্যমান ছিল। একবার হাসান (রাঃ) ছাদাক্বার একটি খেজুর নিয়ে নিজের মুখে প্রবেশ করালেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, ছিঃ ছিঃ, ফেলে দাও! তুমি কি জানো না যে আমরা (আহলে বায়ত) ছাদাক্বার মাল খাই না?।[৩৮] উল্লেখ্য রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজনের জন্য যাকাতের মালের কোন কিছুই হালাল নয়।[৩৯]

গণীমতের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণের অধিকার :

আহলে বায়েতদের জন্য যাকাত গ্রহণ হারাম হ'লেও তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، 'আর তোমরা জেনে নাও যে, যুদ্ধে তোমরা যে সকল বস্তু গণীমত রূপে লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও (দুস্থ) মুসাফিরদের জন্য' *(আনফাল ৮/৪১)*। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা সা'দী বলেন, আর এই খুমুস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ) পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হবে... দ্বিতীয় খুমুস (পঞ্চমাংশ) হ'ল 'যিল কুরবা' তথা নিকটাত্মীয়দের জন্য। আর তারা হ'লেন বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের নবী (ছাঃ)-এর আত্মীয়-স্বজন। আল্লাহ তা'আলা এই অংশটিকে আত্মীয়তার সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যা এই বিষয়ের প্রমাণ যে, এখানে মূল কারণ বা ভিত্তি হ'ল কেবলই আত্মীয়তার সম্পর্ক। ফলে এতে তাদের ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও নারী সকলেই সমান অংশীদার হবে।[৪০]

ফাই-এর এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণের অধিকার :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، 'আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে স্বীয় রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র জন্য ও রাসূলের জন্য এবং তার নিকটাত্মীয়দের ও ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য' *(হাশর ৫৯/৭)*।

উম্মতের পক্ষ থেকে মহব্বত বা ভালোবাসা প্রাপ্তির অধিকার :

আহলে বায়তের প্রত্যেক সদস্যকে ভালাবাসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، 'তুমি বল, আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না কেবল আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত' *(শূরা ৪২/২৩)*। অত্র আয়াতে রাসূল পরিবারের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কুরাইশরা যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন তারা হাসিখুশি ও আনন্দিত মুখে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু তারা যখন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন তারা এমন চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ করে যা আমরা চিনি না অর্থাৎ তারা বিরূপ আচরণ করে। এতে নবী করীম (ছাঃ)) অত্যন্ত রাগান্বিত হ'লেন এবং বললেন, 'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তির অন্তরে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তোমাদেরকে ভালোবাসবে'।[৪১] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ، 'হে মানবমণ্ডলী! যে ব্যক্তি আমার চাচাকে

---

৩৫. ছহীহুল জামে' হা/১৬৬৪; ছহীহুত তারগীব হা/৮০৭।
৩৬. আহমাদ হা/১৩৫৫৭, সনদ ছহীহ।
৩৭. মুসনাদে আহমাদ হা/৬৭২০, সনদ হাসান।
৩৮. মুসলিম হা/১০৭২; মিশকাত হা/১৮২২।
৩৯. নাসায়ী হা/২৪৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৪২৬৫।
৪০. তাফসীরুস সা'দী পৃ. ৩২১।
৪১. আহমাদ হা/১৭৭২; মিশকাত হা/৬১৪৭. সনদ সমালোচিত।

কষ্ট দিল, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। কারণ একজন মানুষের চাচা তার পিতার সমতুল্য বা পিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ'।[৪২]

আহলে বায়তের মর্যাদার ব্যাপারে বিদ্বাগণের অভিমত :

১. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আহলে বায়তের মর্যাদায় কবিতা আবৃত্তি করে বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূলের আহলে বায়ত (পরিবারবর্গ)! আপনাদের ভালোবাসা, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরয যা তিনি কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। আপনাদের মহান গৌরবের জন্য এটুকুই তো যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি আপনাদের প্রতি দরূদ পাঠ করে না, তার ছালাতই হয় না'।[৪৩]

২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, 'তাবেঈ, মুসলমানদের ইমাম, সালাফে ছালেহীন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ফক্বীহগণের মধ্য থেকে নব্বইজন ইমাম এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে সুন্নাহ্র ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন তা হ'ল...আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সমস্ত ছাহাবী, তাঁর সন্তান-সন্ততি, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাঁর শ্বশুরকূল ও জামাতাকূলের সকলের জন্য রহমতের দো'আ করা..।[৪৪]

৩. শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর আহলে বায়ত (পরিবার-পরিজন)-এর এমন কিছু অধিকার রয়েছে যা রক্ষা করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তা'আলা খুমুস (যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ) ও ফাই (বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ)-এর মধ্যে তাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেছেন এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর ওপর ছালাত পাঠ করার পাশাপাশি তাদের ওপরও ছালাত পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব মুহাম্মদের পরিবারের ওপর ছালাত পাঠ করা মুসলমানদের নিকট তাদের একটি প্রাপ্য অধিকার, আর এটি (ছালাত পাঠ) তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম'।[৪৫]

তিনি আরো বলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর আহলে বায়তকে ভালোবাসা ওয়াজিব...। বরং এটি আল্লাহ তা'আলা আমাদের যে সমস্ত বিষয় নির্দেশ করেছেন তারই অন্তর্ভুক্ত, যেভাবে তিনি আমাদের অন্যান্য ইবাদতসমূহের নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৬]

৪. হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেছেন, আহলে বায়েত-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক যে অছিয়ত করা হয়েছে, এবং তাদের প্রতি সদাচরণ, তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কেননা তারা এক পবিত্র বংশধারা থেকে এসেছেন। যা আত্মগৌরব, মর্যাদা ও বংশমর্যাদার দিক থেকে পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত পরিবার। আর এই সম্মান ও মর্যাদা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত হয়, বিশেষ করে যখন তারা সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সঠিক নববী সুন্নাহ্র অনুসারী হন, যেভাবে তাদের পূর্বসূরীগণ ছিলেন। যেমন আব্বাস ও তাঁর সন্তানগণ এবং আলী ও তাঁর পরিবার ও বংশধরগণ।[৪৭]

৫. ইমাম আল-আজুর্রী (রহঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীর ওপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসা ওয়াজিব। আর তারা হ'লেন, বনু হাশেম, আলী ইবনে আবী তালিব এবং তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ; ফাতেমা এবং তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ; হাসান ও হোসাইন এবং তাদের সন্তান ও বংশধরগণ; জাফর আত-তৈয়ার এবং তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ; হামযাহ এবং তাঁর সন্তানগণ; এবং আব্বাস ও তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ। এরাই হ'লেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর আহলে বায়েত। মুসলমানদের ওপর কর্তব্য হ'ল তাদেরকে ভালোবাসা, তাদের সম্মান করা, তাদের কোন ভুলত্রুটি বা কষ্টদায়ক আচরণ সহ্য করা, তাদের সাথে উত্তম আচরণ বজায় রাখা, তাদের ওপর ধৈর্য ধারণ করা এবং তাদের জন্য দো'আ করা। অতঃপর তাদের সন্তান ও বংশধরদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে।[৪৮]

৬. জামালুদ্দীন আল-গজনভী (রহঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর আহলে বায়েত, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ, তাঁর বংশধর, তাঁর নিকটাত্মীয় এবং সকল ছাহাবীকে ভালোবাসি। আমরা তাঁদেরকে কল্যাণের সাথে স্মরণ করি, তাঁদের প্রশংসা করি, তাঁদের জন্য মঙ্গলের দো'আ করি এবং তাঁদের প্রতি রহমত কামনা করি। আমরা তাঁদের কারও ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করি না, আবার তাঁদের কারও কাছ থেকে সম্পর্ক ছিন্নও করি না। যারা তাঁদের ভালোবাসে, আমরা তাঁদের ভালোবাসি; আর যারা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আমরা তাঁদের ঘৃণা করি..। তাঁদের ভালোবাসা হ'ল দ্বীন ও ঈমান, আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ হ'ল কুফর ও সীমালঙ্ঘন।[৪৯]

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, নবী পরিবার বা আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও নাজাতের উপায়। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে তাঁদের অনন্য মর্যাদা, পবিত্রতা ও সুনির্দিষ্ট অধিকার অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাঁদের প্রতি সামান্যতম বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমান বিনষ্টকারী অপরাধ ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। তবে এক্ষেত্রে ইসলাম ও আহলুস সুন্নাহ্র ভারসাম্যপূর্ণ নীতি হ'ল আমরা নবী পরিবারকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসব এবং যথাযথ সম্মান দেব, কিন্তু ভালোবাসতে গিয়ে শরী'আতের সীমা লঙ্ঘন বা কোন বাড়াবাড়ি করব না। মহান আল্লাহ আমাদের হৃদয়ে তাঁদের প্রতি খাঁটি ভালোবাসা দান করুন-আমীন!

৪২. তিরমিযী হা/৩৭৫৮; মিশকাত হা/৬১৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৭০৮৭।
৪৩. আব্দুর রহমান মেছত্বাভী, দেওয়ানুল ইমাম শাফেঈ পৃ. ৯৩।
৪৪. ইবনে আবী ইয়ালা, তাবাকাতুল হানাবিলাহ ১/১৩০।
৪৫. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩/৪০৭।
৪৬. মিনহাজুস সুন্নাহ ৭/১০২।
৪৭. তাফসীরে ইবনু কাছীর ৭/২০১।
৪৮. আশ-শারী'আহ ৫/২২৭৬।
৪৯. উছূলুদ্দীন পৃ. ২৮৯-২৯২।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -*সম্পাদক*।

বাংলাদেশের বন্যা : বাস্তবতা ও করণীয়

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদী এ দেশের প্রাণ, কৃষিনির্ভর অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। কিন্তু এই নদীই যখন ফুঁসে ওঠে, রূপ নেয় দুর্বার স্রোতে, বর্ষার অবিরাম বর্ষণ ও উজানের ঢলে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ বন্যা, তখন প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য মুহূর্তেই রূপান্তরিত হয় জনদুর্ভোগের করুণ চিত্রে। বিস্তীর্ণ জনপদ তলিয়ে যায় পানির নিচে, ভেঙে পড়ে ঘরবাড়ি, ডুবে যায় ফসলের মাঠ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কাঠামো।

প্রায় সহস্র নদী-উপনদী বেষ্টিত পৃথিবীর বদ্বীপখ্যাত এই ভূখণ্ডটি ভৌগোলিকভাবেই বন্যাপ্রবণ। আবহাওয়া পরিবর্তন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পানি আগ্রাসন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, নদী দখল ও ভরাট, বন উজাড় এবং পরিবেশের প্রতি মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত আচরণ এই দুর্যোগকে আরও ঘনঘন ও ভয়াবহ করে তুলছে। অতীতে প্রতি দশক বা কাছাকাছি ব্যবধানে একেকটি বড় বন্যা দেখা গেলেও এখন প্রায় ফি বছরই বন্যার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। এ যেন এক নিষ্ঠুর পুনরাবৃত্তি। প্রশ্ন হচ্ছে- কেন এই পুনরাবৃত্তি? কেন আমরা বার বার এই পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি? এর প্রতিকারইবা কী? এ প্রশ্নগুলোরই উত্তর খুঁজবো আলোচ্য নিবন্ধে।-

বিগত চিত্র ও ক্ষয়ক্ষতি : স্বাধীনতার পর ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭, ২০১৭, ২০২২ ও ২০২৪ সালের বন্যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এর মধ্যে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় দেশের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। আর স্থায়িত্বের দিক দিয়ে ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল দীর্ঘ সময়ের। সে বছর টানা ৬৫ দিন দেশের ৬৭-৬৮% ভাগ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে এযাবত বাংলাদেশে সংঘটিত বড় বড় বন্যায় সরাসরি মৃত্যু হয়েছে আনুমানিক ৬ হাযারের অধিক। তবে ৭৪ সালের বন্যা ও পরবর্তী দুর্ভিক্ষে আরো ২৮ হাযার ৭ শত জনের মৃত্যু মিলিয়ে এই সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাযারেরও অধিক। অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে আনুমানিক ১৩-১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী প্রায় ১.৬১-১.৮৫ লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ। ফসলী জমির ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩০-৪০ লাখ হেক্টর। 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর' (DDM) ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ১০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৯-১০ হাযার হেক্টর কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ১-২ লাখ মানুষ প্রতিবছর নদীভাঙ্গনের প্রত্যক্ষ শিকার হয়ে বাস্তুচ্যুত হয়। 'সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস' (CEGIS)-এর গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৭৩ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে শুধু পদ্মা ও যমুনা নদীগর্ভেই বিলীন হয়েছে ১ লাখ ১৭ হাযার হেক্টরেরও বেশি জমি।

কেন এই ভয়াবহতা? বাংলাদেশে বন্যার ভয়াবহতা ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পিছনে মৌলিকভাবে দু'টি কারণকে চিহ্নিত করা হয়। এক- ভৌগোলিক কারণ, দুই-মানবসৃষ্ট কারণ।

১. ভৌগলিক কারণ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূপ্রকৃতি এবং আবহাওয়া বা জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের কারণে নিয়মিত বন্যা হয়ে থাকে। হিমালয় থেকে উৎসারিত তিনটি বৃহৎ নদী: গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পলল দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ হচ্ছে বাংলাদেশ। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভাটির দেশ এবং নদীমাতৃক দেশ হিসাবে পরিচিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর বিশাল অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উজানের বিপুল পরিমাণ পানি শেষ পর্যন্ত এ দেশেই এসে জমা হয়। ফলে অতিবৃষ্টি না হ'লেও উজানের ঢলে অনেক এলাকা প্লাবিত হয়। এছাড়া জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৌসুমী বৃষ্টিপাতে দেশের নদ-নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। স্বল্প সময়ে অতিবৃষ্টি হ'লে নদীর ধারণক্ষমতা অতিক্রম করে পানি আশপাশের জনপদে ছড়িয়ে পড়ে। ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনের পার্বত্য অঞ্চলে অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট ঢলও বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করে। দীর্ঘদিন নদী খনন না হওয়া, পলি জমা, দখল ও দূষণের কারণে নদীর পানি ধারণক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে অল্প বর্ষণেই নদী উপচে বা বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার সৃষ্টি হয়।

২. মানবসৃষ্ট কারণ : বন্যা শুধুমাত্র ভৌগোলিক কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এজন্য মানবসৃষ্ট বহু কারণও দায়ী। নদী দখল করে বহুতল ভবন নির্মাণ, খাল-বিল ভরাট করে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন, জলাধার ধ্বংস করে কংক্রিটের নগর বানানো, বন উজাড় করা, পাহাড় কাটা, নদীর নাব্যতা রক্ষায় অবহেলা করা ইত্যাদি কারণে পানির নির্ধারিত গতিপথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানি যখন তার স্বাভাবিক গন্তব্য খুঁজে না পায়, তখন তা জনপদ, ফসলের মাঠ, রাস্তা-ঘাট ও বসতবাড়িকে প্লাবিত করে।

উন্নয়নের নামে এমন বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যেখানে পরিবেশগত প্রভাবকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়না। অনেক সড়ক, বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণে পানিপ্রবাহের স্বাভাবিক পথ সংকুচিত হয়ে পড়ছে। শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা আবর্জনায় ভরে থাকছে, খালগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে। ফলে অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই নগরজীবন স্থবির হয়ে পড়ছে।

আরও উদ্বেগজনক বিষয় হ'ল, পরিবেশ ধ্বংসের মাধ্যমে আমরা বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনকেও ত্বরান্বিত করছি। শিল্পায়ন, জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার এবং নির্বিচারে বন উজাড়ের ফলে ক্রমশ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাবে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, আকস্মিক বন্যা এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ মানুষের কর্মকাণ্ড এখন স্থানীয় নয়, বৈশ্বিক বিপর্যয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ভৌগোলিক ও মানবসৃষ্ট উভয় কারণেই প্রতিনিয়ত আমরা বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগর স্বীকার হচ্ছি।

বন্যার প্রভাব : বন্যার প্রভাব বহুমাত্রিক। প্রতি বছর বন্যায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। শত শত বসতবাড়ি ধ্বংস হয়, হাযার হাযার হেক্টর কৃষিজমি ও ফসলের ক্ষতি হয়, অবকাঠামো ভেঙে পড়ে এবং দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। বন্যা ও

তৎপরবর্তী দূষিত পানির কারণে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েডসহ বিভিন্ন রোগব্যাধির বিস্তার ঘটে। মোটাদাগে বন্যা দারিদ্র্য ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণে পরিণত হয়।

প্রতিকারের উপায় : বন্যা বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু আমাদের চরম ব্যর্থতা হচ্ছে বন্যা ব্যবস্থাপনায় আমরা দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিনি। প্রতিবছর বন্যা হ'লে কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, আর মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণা, অনেক ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক কিছু প্রচারণা ছাড়া কার্যকর কিছু হয় না। ফলে মানুষ একই সংকটে বারবার পতিত হয়।

ত্রাণ নয় পরিত্রাণ চায় : বার বার বানের পানিতে হাবুডুবু খাওয়া মানুষগুলো এখন যেন আর ত্রাণ নিতে আগ্রহী নন। তারা এখন ত্রাণ নয়, পরিত্রাণ চায়। চায় বানের পানি থেকে মুক্তির স্থায়ী বন্দোবস্ত। যদিও বন্যা-খরা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধ্বস ইত্যাদি সকল দুর্যোগেরই নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন মহান আল্লাহ। তবে যেহেতু আমাদের কর্মকাণ্ড, দায়িত্বহীনতাও এর জন্য দায়ী, সেকারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণে কিছু টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সেই সাথে মহান আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ঈমান সহ এই জাতীয় দুর্যোগ থেকে পানাহ চাইতে হবে। এক্ষণে বন্যা প্রতিরোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা আবশ্যক-

১. নদী খনন ও পানি নিষ্কাশন : বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদী খনন (ড্রেজিং) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ব্যবস্থা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীর তলদেশে পলি জমে নাব্যতা কমে যায়। ফলে বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নদী ধারণ করতে পারে না। তখন নদীর পানি উপচে পড়ে, তীর ভেঙ্গে আশপাশের জনপদ প্লাবিত হয়। নিয়মিত নদী খননের মাধ্যমে নদীর গভীরতা ও পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যেন পানি দ্রুত সাগরে প্রবাহিত হ'তে পারে। এতে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা ও বন্যার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে।

২. টেকসই বাঁধ ও স্লুইস গেট ব্যবস্থাপনা : পরিকল্পিত বাঁধ ও স্লুইস গেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের পানি নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ এলাকায় নদীর অতিরিক্ত পানি নিয়ন্ত্রণে বাঁধ ও স্লুইস গেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. আন্তঃরাষ্ট্রীয় নদীর ন্যায্য হিস্যা লাভে জোরালো ভূমিকা: প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পানি আগ্রাসন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভারতের একতরফা নদী শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'য়ে পরিণিত হয়েছে। ভারত আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে অভিন্ন নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে যুগ যুগ ধরে একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ভাটির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিবছর চরম পানিসংকট ও পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আবার বর্ষাকালে হঠাৎ বাঁধের গেট খুলে দিলে বাংলাদেশে আকস্মিক বন্যায় তলিয়ে যায়। ডুবিয়ে ও শুকিয়ে মারার এই ভারতীয় নীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফোরামে দাবী উত্থাপন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে তৎপর হ'তে হবে।

৪. বন্যা পূর্বাভাস ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা : আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বন্যা পূর্বাভাস আরও নিখুঁত করা যেতে পারে। এতে কৃষক বা সাধারণ মানুষ যেন আগেভাগে প্রস্তুতি নিতে পারে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।

৫. টেকসই কৃষি ব্যবস্থা : বন্যাপ্রবণ এলাকায় ভাসমান বাগান, উচ্চফলনশীল ও পানি-সহনশীল ফসল চাষ, জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি টেকসই কৃষি ব্যবস্থা হাতে নেয়া যেতে পারে।

৬. নিরাপদ বাসস্থান ও পুনর্বাসন নীতি : যারা প্রতিবছরই ঘর হারায়, তাদের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি সহায়তায় উঁচু জমিতে বাড়ি ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. নদী দখল, তীর ঘেঁষে অবৈধ দখল, ময়লা ডাম্পিং, অবৈধ বালু উত্তোলন এবং অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

৮. নদীর নাব্যতা বাড়াতে বড় নদী, হাওড়, পুকুর-দীঘি, জলাশয় তৈরি করতে হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে কৃষি ও সেচ কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. দেশের উজানে বনায়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং চাষাবাদে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

১০. ঈমানী চেতনা : সর্বোপরি আমাদের ঈমানী দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এই বিপর্যয়ের জন্য আমরাও দায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষের কৃতকর্মের ফলে স্থলে ও জলে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, যাতে আল্লাহ তাদের কিছু কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যেন তারা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসে' *(আর-রূম, ৩০/৪১)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের ওপর যে বিপদ আসে, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক পাপই মার্জনা করে দেন' *(শূরা ৪২/৩০)*। এটি মুমিনের জন্য ঈমানী পরীক্ষা। তিনি বলেন, 'অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের' *(বাক্বারাহ, ২/১৫৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমের ওপর ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট বা এমনকি কাঁটার খোঁচাও লাগে না, যার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেন না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩৭)*।

অতএব মুসলিম হিসাবে আমাদের করণীয় হচ্ছে- তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করা; গোনাহ থেকে তওবা ও ইস্তিগফার করা; আল্লাহ্র দিকে সম্পূর্ণ রুজূ হওয়া; বিপদে ধৈর্যধারণ করা ও আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখা; প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৈজ্ঞানিক কারণকে অস্বীকার নয়, বরং সেই কারণগুলোর ওপর আল্লাহ্র সর্বময় ইচ্ছা ও হিকমতের প্রতি ঈমান রাখা। মহান আল্লাহ চাইলে তাঁর অদৃশ্য ইশারায় জনপদকে নিরাপদ করতে পারেন। নদীর গতিপথকে প্রবল করে দিতে পারিন। সেই তাওয়াক্কুল নিয়ে তাঁর দরবারেই আমাদের আকুতিভরা প্রার্থনা, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করুন, আমাদেরকে এমন কোন পরীক্ষায় ফেলবেন না, যা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। হে মহান রব! ইসলামের স্বার্থে আপনি আমাদের এই জনপদকে নিরাপদ করুন-আমীন!!

বিশ্বকাপের মোহে বেহুঁশ তারুণ্য : একটি আত্মজিজ্ঞাসা

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান

১৯শে জুলাই শেষ হ'ল ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬। আতশবাজির ঝলকানি আর বিজয়ের উল্লাসে বিশ্বকাপের পর্দা নেমেছে। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা এখনও অর্জন করতে না পারলেও সম্ভবত তামাম দুনিয়ার মধ্যে এদেশেই বিশ্বকাপের আমেজ-উন্মাদনা সর্বাধিক। দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যে, ঘোরলাগা হরিণের মতো ছুটে চলেছে কোটি তরুণের হৃদয়। প্রায় ১৫ হাযার কিলোমিটার দূরত্বকে ছাপিয়ে পতাকার প্রতিযোগিতা, মিছিল-মিটিং, শোডাউন, বাক যুদ্ধ থেকে মারামারি, সময় ও অর্থের বিলাসিতা এক অর্থহীন উন্মাদনায় মেতেছিল আমাদের তরুণ সমাজ। যে তারুণ্যের দায়িত্ব ছিল দেশের খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া, যাদের কর্তব্য ছিল দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, ইলম ও আমলের আলোয় সমাজকে আলোকিত করা, সেই সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজ আজ ভিনদেশী পতাকার নীচে নিজেদের বিবেক বন্ধক রেখেছে। বিবেকের এই চরম দেউলিয়াত্ব কেবল সময় বা অর্থের অপচয়েই থেমে থাকেনি, বরং তা জন্ম দিয়েছে লাশের এক দীর্ঘ সারি।

আত্মহননের মিছিল : বিশ্বকাপ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ফুটবল-সংশ্লিষ্ট ঘটনায় অন্তত ২০ জন ভক্তের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ১২ জনই বাংলাদেশের। তাদের মধ্যে তিনজনকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া পতাকা টাঙাতে গিয়ে বহুতল ভবন থেকে পড়ে এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে তিনজন। আবার প্রিয় দলের পরাজয়ের ক্ষোভে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছে কয়েকজন এবং কুষ্টিয়ায় ১৯ বছর বয়সী এক তরুণ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এছাড়াও আহত হয়েছেন অন্তত ৪৫ জন।[১] যে জীবন আল্লাহ্‌র দেওয়া পবিত্র আমানত, যে জীবন দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত জয় করার কথা ছিল, তা বেঘোরে শেষ হয়ে গেল কেবল একটা খেলার জন্য? এই আত্মহনন কেবল ১২টি প্রাণ কেড়ে নেয়নি, বরং ১২টি পরিবারকে চিরতরে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে।

পতাকার প্রতিযোগিতা ও বিবেকের দেউলিয়াত্ব : হাযার হাযার টাকা খরচ করে ভিনদেশের আকাশচুম্বী পতাকা ওড়ানোর এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের অন্ধ বিবেকের সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ সাক্ষী। যে অর্থ দিয়ে ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যেত, নেয়া যেত কোন দরিদ্র শিক্ষার্থীর শিক্ষার দায়িত্ব, সেই অর্থ দিয়ে মাগুরার আমজাদ হোসাইন বানিয়েছেন সাড়ে ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ জার্মানীর পতাকা। স্রেফ এক মুহূর্তের জোশ আর দেখনদারির নামে উড়িয়ে দিলেন ১০ শতাংশ জমির বিক্রিত ৫ লাখ টাকা। অন্যদিকে কোটি কোটি অন্ধ ভক্ত পাড়া-মহল্লার অলিতে-গলিতে আর বাড়ীর ছাদে ভিনদেশী পতাকা উড়ানোর নামে অপচয়ের এক নির্লজ্জ লীলা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ নির্মম বাস্তবতা হ'ল, আজকের বিশ্বে প্রায় ৬৬ কোটি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী অনাহারে ভুগছে।[২] এমনকি নিজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যায় মানবতা যখন ডুবছে, তখনও কোটি কোটি পতাকাপ্রেমীদের বিবেক জাগ্রত হয় না। হায় আফসোস! শতকোটি আফসোস এই অন্ধ বিবেকের প্রতি!

সময়ের মহাধ্বংসযজ্ঞ : এবারের বিশ্বকাপের সময়সূচিগুলো ছিল ঠিক ফজরের ওয়াক্তের আশেপাশেই। একটি ম্যাচের পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ঘুম রাত কাটানো, ফজরের পবিত্র মুহূর্তে ছালাত বাদ দিয়ে গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে টিভি স্ক্রীনের সামনে অধীর নেত্রে বসে থাকার দৃশ্যগুলো যেকোন ঈমানদার মানুষের হৃদয়ে চরম আক্ষেপের জন্ম দিয়েছে। এই উন্মাদনা দেখে অনেকে বলেছিলেন, ইস! এই তরুণরা যদি আজকে ফজরে মসজিদে আসতো! যদি তাদের এই সময়ের কুরবানীগুলো ইসলামের তরে হ'ত; তবে কি আমরা আজ বিদেশী প্রভুর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতাম? কি অদ্ভুত ঘোরে নিপতিত জীবন! যে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান নে'মত 'সময়', তা আজ স্রেফ বিনোদনের নামে গিলে খাচ্ছে ভিনদেশী সংস্কৃতির এই আসক্তি। এই সময়ের হিসাব কি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে দিতে হবে না?

অন্ধ ভালোবাসার মোহ : প্রিয় দলের বিজয়োল্লাসে সিজদায় লুটিয়ে পড়া, ছালাতে তাদের জন্য দো'আ করা অথবা দান-ছাদাক্বা করার মতো পবিত্র ইবাদতগুলোকেও আজ স্রেফ তামাশায় পরিণত করা হয়েছে। জন্মদাতা পিতাকে ভুলে গিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির ভিনদেশী কোন খেলোয়াড়কে 'মেসি আমার আব্বা' বলে সম্বোধন করা আমাদের যুবসমাজের ঈমানী চেতনার চরম দেউলিয়াত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু তাই নয়, প্রিয় দলের পরাজয়ে কিংবা প্রিয় খেলোয়াড়ের বিদায়ে তরুণ-তরুণীদের চোখের পানি যেন আজ বাঁধ মানছে না। তারা ডুকরে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। হায় আফসোস! বিশ্বজুড়ে মযলূম মুসলিমদের আর্তনাদ শুনে কিংবা নিজেদের জীবনের পর্বতসম পাপের অনুশোচনায় যে চোখ কখনো ভেজে না, আল্লাহ্‌র ভয়ে যে চোখে এক ফোঁটা পানিও আসে না, সেই চোখ আজ অঝোরে কাঁদছে ভিনদেশী খেলোয়াড়ের জন্য।

জুয়া ও পতিতাবৃত্তির অন্ধকার থাবা : এই উন্মাদনার সবচেয়ে অন্ধকার দিকটি হ'ল পর্দার আড়ালে চলা 'জুয়া' বা বাজি ধরার আসর। খেলার জয়-পরাজয় নিয়ে পাড়া-মহল্লা থেকে শুরু করে অনলাইনে চলে কোটি কোটি টাকার জুয়ার আসর। অন্যদিকে আয়োজক দেশগুলোতে চলছে পতিতাবৃত্তির মহোৎসব। এদিকে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠগুলোতে চলছে নারী-পুরুষের অবাধ অংশগ্রহণে বিশ্বকাপ দেখার নগ্ন প্রতিযোগিতা। যা তরুণদের নৈতিক ও মানবিক পঙ্গুত্ব যেমন নিশ্চিত করেছে, তেমনি হরণ করছে তাদের সততা ও আত্মমর্যাদার সৌন্দর্য।

হে প্রিয় তরুণ সমাজ! পরজীবী উন্মাদনার এই ঘোর থেকে বেরিয়ে এখন নিজেদের আত্মপরিচয় খোঁজার সময় এসেছে। একটি চামড়ার বলের পেছনে জীবনের মূল্যবান সময়, অর্থ আর তাজা প্রাণ বিলিয়ে দেওয়া কোন বীরত্ব নয়, বরং তা চরম কাপুরুষতা। আয়োজক ও খেলোয়াড়েরা নিজেদের লাভের হিসাব ঠিকই বুঝে নিয়েছে, কিন্তু বিশ্বকাপকে ঘিরে যে ১২টি তাজা প্রাণ চিরতরে ঝরে গেল বা যে কোটি কোটি অর্থের নির্মম অপচয় হ'ল, তা কি আর কোনদিন ফিরে আসবে? দুনিয়া ও আখেরাতের চূড়ান্ত হিসাবের খাতায় এই উন্মাদনার ফলাফল একটি ফাঁকা বৃত্ত বা 'শূন্য' ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই অন্য সব কোলাহল থামিয়ে নিজের বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আজ শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন: যে ট্রফি অন্যের ঘরে যায়, তার উল্লাসে আমরা যে জীবনের অমূল্য সময়টুকু হারিয়ে ফেললাম–হাশরের ময়দানে এই শূন্য হাতের হিসাব আমরা কিভাবে মেলাব?

---

১. *দৈনিক সময়ের আলো, ১৪ই জুলাই ২০২৬।*
২. *www.surl.li /kvhhck*।

ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মদীনায় হিজরত :

ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) আবিসিনিয়ায় (হাবশায়) হিজরতকারী মুসলমানদের অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই আবিসিনিয়ায় হিজরত হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে পুনরায় মদীনায় হিজরত করেন। এ কারণে তাঁকে ‘যুল হিজরাতাইন’ (ذو الهجرتين) বা দুই হিজরতের অধিকারী বলা হয়। মদীনায় হিজরতের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রগামী মুহাজিরদের অন্যতম ছিলেন। মদীনায় হিজরতের সময় পরিবারের কাউকেই তিনি মক্কায় রেখে যাননি। পরিবারের সকল পুরুষ ও নারী সদস্যকে নিয়ে হিজরত করেছিলেন।[১] আয়েশা বিনতে কুদামা বলেন, ওছমান, কুদামা ও আব্দুল্লাহ তিন ভাই এবং মু‘আম্মার বিন হারিছ মদীনায় হিজরত করে আব্দুল্লাহ বিন সালামা আল-আজলানীল বাড়ীতে অবস্থান করেন। ওয়াকেদী বলেন, মাযঊন পরিবার হিজরতে এতটাই সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে, মক্কায় তাদের বড়ীগুলো পুরো খালি হয়ে গিয়েছিল।[২]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ :

ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) মদীনায় হিজরতের পর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। দ্বিতীয় হিজরীতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেকারণ যুদ্ধে শরীক হওয়ার তেমন কোন সুযোগ তিনি পাননি। তবে দ্বিতীয় হিজরী সনে সংঘটিত ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি, তার ভাই আব্দুল্লাহ ও পুত্র সায়েব বীরত্বের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর হায়াতের গাড়ী ইতিমধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার সময় পথিমধ্যে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এই অসুখেই ইহজগতের মায়াজাল ছিন্ন করে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে অন্তহীন পথের যাত্রী হন।[৩]

রাসূল (ছাঃ)-এর ভালোবাসা :

তিনি সেই সৌভাগ্যশালী ছাহাবী, যার মৃত্যুর পর স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) তার কপালে মুহাব্বতের পরশমাখা চুমো দিয়ে অঝোর নয়নে কেঁদেছিলেন। রাসূলের নীরব অশ্রুবিন্দু তাঁর দুই কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي، أَوْ قَالَ: عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-কে চুম্বন করেন এবং কাঁদেন। তিনি (রাবী) বলেন, এ সময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে’।[৪] অন্য বর্ণনামতে আয়েশা (রাঃ) বলেন, فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ، ‘আমি যেন এখনো তাঁর দু’গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখছি’।[৫]

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে, ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন রাসূল (ছাঃ) তার মুখের কাপড় সরিয়ে দুই চোখের মাঝখানে কপালে চুমো দেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদেন। অতঃপর তাঁকে খাটিয়ায় উঠানোর সময় বলেন, طُوبَى لَكَ يَا عُثْمَانُ، لَمْ تَلْبَسْكَ الدُّنْيَا وَلَمْ تَلْبَسْهَا ‘সুসংবাদ তোমার জন্য, হে ওছমান! দুনিয়া তোমাকে কলুষিত করতে পারেনি, আর তুমিও দুনিয়ার মোহে নিজেকে জড়াওনি’।[৬]

উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির শোকে মাতম করা, চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছিঁড়া ইত্যাদি শরী‘আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, ‘অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، ‘ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে শোকে গাল চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে মাতম করে’।[৭] তিনি আরো বলেন, أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَقَالَ:النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ، ‘আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি স্বভাব রয়েছে, যা তারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে না। সেগুলো হ’ল- ১. বংশ-মর্যাদা নিয়ে অহংকার করা, ২. অন্যের বংশ-পরিচয় নিয়ে কটাক্ষ করা, ৩. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা (অর্থাৎ নক্ষত্রকে বৃষ্টির কারণ বা প্রভাবক মনে করা) এবং ৪. মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ বা মাতম করা। এরপর তিনি বলেন, যে নারী (বা ব্যক্তি) মৃতের জন্য বিলাপ ও মাতম করে, সে যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তবে ক্বিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় দাঁড় করানো হবে যে, তার পরনে থাকবে গলিত

১. *আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯০।*
২. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।*
৩. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবা, তাহক্বীক্ব: ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুরকী (কায়রো, মিসর: ২০০৮ খৃ. ১৪২৯ হি), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১১; আছহাবুর রাসূল (ছাঃ), পৃ: ৬৭; আল-মুনতাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯১।*

৪. *তিরমিযী, হা/৯৮৯ সনদ ছহীহ।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/১৪৫৬ সনদ ছহীহ।*
৬. *আল-মুনতাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯১; সিয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৯।*

আলকাতরার (কাতরান) পোষাক এবং খোস-পাঁচড়াজনিত পুঁজে-আচ্ছাদিত একটি বর্ম'।[৮]

তবে কারো বিয়োগ ব্যথায় স্বাভাবিকভাবে চোখের পানি ফেলা ও নীরবে কান্না করা জায়েয। যেমনটি রাসূল (ছাঃ) ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে করেছিলেন। দুনিয়াত্যাগী পরহেযগার এই সাথীর বিদায় যেন তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। হৃদয়ের গভীরে এক কষ্টকর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। নীরব অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল তাঁর দু'চোখ দিয়ে। একইভাবে স্বীয় পুত্র ইবরাহীম (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময়ও রাসূল (ছাঃ) নীরবে কেঁদেছিলে এবং বলেছিলেন, إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، 'নিশ্চয়ই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়; তবে আমরা কেবল সে কথাই বলি যা আমাদের রবের সন্তুষ্টির কারণ হয়'।[৯]

প্রিয় পাঠক! কতইনা সৌভাগ্যবান ছাহাবী ছিলেন তিনি। যার প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল যে, তিনি ওছমানের বিদায়ে অশ্রু ধরে রাখতে পারলেন না। এমনকি মমতার পরশ বুলিয়ে শেষবারের মত মৃত ওছমানের কপালে হৃদয়ের আকুতি মিশ্রিত চুমো দিয়ে বিদায় জানালেন।

মৃত্যু :

আনুগত্য ও ইবাদতে পরিপূর্ণ এক নাতিদীর্ঘ পথচলা শেষে এই মহান ছাহাবী মৃত্যুর বিছানায় শায়িত হ'লেন। খারিজাহ বিন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উম্মুল 'আলা নামক জনৈকা আনছারী মহিলা, যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন, (হিজরতের পর) লটারির মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে আনছারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হচ্ছিল। আমাদের ভাগে আসলেন ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)। আমরা তাঁকে আমাদের ঘরের মেহমান করে নিলাম। এরপর তিনি এমন এক ব্যথায় আক্রান্ত হ'লেন, যে ব্যথায় তার মৃত্যু হ'ল। মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল দেয়া হ'ল। তাঁর কাপড় দিয়েই তাঁকে কাফন পরানো হ'ল'।[১০] তিনি সেই সৌভাগ্যবান ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর জানাযা আদায় করেন। দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে বদর যুদ্ধের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১১] তার মৃত্যুতে জনৈকা নারী শোকগাথা গেয়ে বলেন,

يَا عَيْنُ جُودِي بِدَمْعٍ غَيْرِ مَمْنُونٍ
عَلَى رَزِيَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون

'হে চোখ! ওছমান বিন মাযঊনের এই মহা বিপদে বা মৃত্যুতে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন দাও, যেন এই ধারা কখনো শেষ না হয়'।[১২]

৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭২৫।*
৮. *মুসলিম, হা/৯৩৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২২৯৬৩; মিশকাত হা/১৭২৭।*
৯. *বুখারী হা/১৩০৩; মুসলিম হা/ ২৩১৫।*
১০. *বুখারী হা/১২৪৩, ২৬৮৭।*
১১. *সিয়ারু, ১ম খণ্ড, পৃ ১৫৫; আল-মুনতাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯১।*
১২. *আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১১।*

মৃতব্যক্তির আখেরাত সম্পর্কে নিশ্চিত মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সতর্কতা :

পরকালে কে সম্মানিত, কে অসম্মানিত, কে নাজাতপ্রাপ্ত এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণ গায়েবের খবর। মহান আল্লাহ ব্যতীত যে বিষয়ে কারো কোন ইলম নেই। তবে যেটুকু রাসূল (ছাঃ)-কে আগাম জানানো হয়েছে এবং তিনি উম্মাহ্কে জানিয়েছেন সেটুকু ব্যতীত। সেকারণ ব্যক্তির পরহেযগারিতা দেখেই মন্তব্য করা যাবে না যে, তিনি আখেরাতে সম্মানিত হয়েছেন। তবে তার কল্যাণের জন্য ও তার নাজাতের জন্য দো'আ করতে হবে। ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর এরকমই একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ঘটেছে। যা ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। ওছমানের গোসল ও কাফন পরানোর পর যখন রাসূল (ছাঃ) আসলেন, তখন উম্মুল 'আলা, মদীনায় যার বাসায় ওছমান (রাঃ) আশ্রিত ছিলেন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে শুনিয়ে ওছমান বিন মাযঊনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، 'তোমার ওপর আল্লাহ্‌র রহমত হোক হে আবূ সায়েব! (ওছমান) তোমার বেলায় আমার সাক্ষ্য এটাই যে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ، 'তুমি কী করে জানলে যে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন?' উম্মুল 'আলা বলেন, আমি বললাম, لاَ أَدْرِى بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি জানিনা (তাহ'লে আল্লাহ কাকে সম্মানিত করবেন?)' তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ وَإِنِّى لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِى، 'আল্লাহ্‌র কসম! ওছমানের নিকট তো নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) এসে গেছে। আমি তাঁর জন্য কল্যাণই আশা করি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না, আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে?' তখন উম্মুল 'আলা (রাঃ) বলেন, فَوَاللهِ لاَ أُزَكِّى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর কখনো কারো পবিত্র হওয়ার সাক্ষ্য দেব না'। (উম্মুল 'আলা বলেন,) এতে আমি দুঃখিত হ'লাম। অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমে স্বপ্নে দেখলাম যে, ওছমান (রাঃ)-এর জন্য একটি প্রবাহমান ঝরনা রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে স্বপ্নের খবর জানালে তিনি বললেন, ذَلِكَ عَمَلُهُ، 'ওটা তাঁর আমল' (সৎকর্ম)'।[১৩]

অতএব বুঝা গেল যে, মাইয়েতের পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত কোন মন্তব্য করা সমীচীন নয়। যেমনটি প্রচলিত আছে যে, 'মরহূম' 'মাগফূর' ইত্যাদি। বরং বলতে

১৩. *বুখারী হা/১২৪৩, ২৬৮৭।*

হবে 'রাহিমাহুল্লা'হ বা আল্লাহ তার উপর রহম করুন। 'গাফারাল্লাহ লাহু' বা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন ইত্যাদি।

বাক্বীউল গারক্বাদে প্রথম সমাহিত :

মদীনায় মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই প্রথম মৃত্যুবরণ করেন এবং বাক্বীউল গারক্বাদে (জান্নাতুল বাক্বী) মুহাজির ছাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম দাফনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাকে দাফন করার পর রাসূলুল্লাহ তাঁর মাথার পাশে একটি পাথর রেখে বলেছিলেন, هَذَا قَبْرُ فَرَطِنَا 'এটি আমাদের অগ্রগামীর কবর'।[১৪] উক্ত মর্মে আবূদাঊদে বর্ণিত আছে, কাছীর বিন যায়েদ আল-মাদানী হ'তে, তিনি মুত্তালিব হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ كَثِيرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي، 'যখন ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তাঁর জানাযা বের করা হ'ল এবং তাঁকে দাফন করা হ'ল। এরপর নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনতে বললেন। কিন্তু লোকটি সেটি বহন করতে পারছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই পাথরটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর উভয় বাহুর কাপড় গুটিয়ে নিলেন। কাছীর বলেন, মুত্তালিব আমাকে বলেছেন, যিনি তাঁকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, মনে হচ্ছে আমি এখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই বাহুর শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি, যখন তিনি কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর তিনি নিজেই পাথরটি বহন করে ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর মাথার কাছে রাখলেন এবং বললেন, أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي، 'এই পাথরের মাধ্যমে আমি আমার ভাইয়ের কবরটি চিহ্নিত রাখব এবং আমার পরিবারের যে-ই মৃত্যুবরণ করবে, তাকে তাঁর পাশে দাফন করব'।[১৫]

শিক্ষনীয় :

ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর জীবন কেবলমাত্র একটি জীবনী নয়, বরং তাঁর জীবনটাই ঈমান ও আমলের একটি বড় পাঠশালা। তাঁর জীবনী থেকে আমরা বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করতে পারি। যেমন-

১. সুস্থ বিবেক : তিনি নৈতিকতা ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন একজন বিনম্র মানুষ ছিলেন। তাঁর বিবেক এতটাই সুস্থ ও সজাগ ছিল যে, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার আগেই তিনি ক্ষতিকর পানীয় মদ বর্জন করেছিলেন। এ ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সত্য গ্রহণের জন্য পবিত্র মানসিকতা ও সুস্থ বিবেক প্রয়োজন।

২. ঈমানী দৃঢ়তা : তাঁর মধ্যে ঈমানের দৃঢ়তা এতটাই প্রকট ছিল যে, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ওয়ালিদ বিন মুগীরার নিরাপত্তা ত্যাগ করেছিলেন স্রেফ আল্লাহ্‌র উপর অঘাধ ঈমান ও তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে। বলেছিলেন, মুমিনের জন্য আল্লাহ্‌র নিরাপত্তাই শ্রেষ্ঠ।

৩. ছবরের শিক্ষা : কাফেরদের নির্যাতনের মুখেও তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও মহান আল্লাহ্‌র শোকরগুযার। লাবীদের মজলিসে এক চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হ'লে তিনি তার অপর চোখটি আল্লাহ্‌র পথে আঘাতের জন্য প্রস্তুত- এই ঘোষণা দেন। যা মুমিনদের জন্য গভীর অনুপ্রেরণা।

৪. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন : অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সংসার ত্যাগের ইচ্ছাকে রাসূল (ছাঃ) নাকচ করে দিয়ে রাসূলের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে ইসলাম যে বাস্তব ও মানবিক ধর্ম সেটি ফুটে উঠেছে। যুগ যুগ ধরে উম্মাহ এখান থেকে ইবরত হাছিল করবে।

৫. নেতৃত্বের গুণ : তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিল। হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দলের নেতা হিসাবে তিনি চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও মুসলমানদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। এতে নেতৃত্বের গুণের ছবক পাওয়া যায়। এ ছাড়াও তাঁর জীবনী থেকে আরো শিক্ষা লাভ করা যায় যে,

৬. বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনুকূল পারিবেশে হিজরত করা যায়।

৭. মৃত্যুর পর মৃতের জন্য স্বাভাবিকভাবে কান্না করা বৈধ, কিন্তু মাতম ও বিলাপ করা নিষিদ্ধ।

৮. কারও জান্নাত বা জাহান্নাম সম্পর্কে দলীল ছাড়া নিশ্চিত মন্তব্য করা উচিত নয়।

৯. প্রকৃত মর্যাদা তাক্বওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

১০. মৃত ব্যক্তিকে পরম মমতায় চুমু দেওয়া যায়।

উপসংহার : ওছমান ইবনু মাযঊন (রাঃ) ছিলেন ইসলামের সূচনালগ্নের এক নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। তাঁর জীবন ঈমানের দৃঢ়তা, ইবাদতের গভীরতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর মৃত্যুতে নবী করীম (ছাঃ)-এর অশ্রু ও ভালোবাসা তাঁর মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। আজকের মুসলিম সমাজ যদি তাঁর ত্যাগ, তাক্বওয়া, নৈতিকতা ও আদর্শকে ধারণ করতে পারে, তবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ, সর্বক্ষেত্রেই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য পুনরুজ্জীবিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই মহান ছাহাবীর জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দান করুন-আমীন!!

---

১৪. *সিয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৫।*
১৫. *আবূদাঊদ, হা/৩২০৬, সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৬০।*

স্মার্টফোন আসক্তি : সময় ও মেধার নীরব ঘাতক

*-হাসীবুর রশীদ**

ভূমিকা : আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম বিস্ময় স্মার্টফোন। বিজ্ঞানের যেকোন আবিষ্কারই প্রাথমিকভাবে মানুষের কল্যাণে সাধিত হয়। কিন্তু বিপত্তি ঘটে তখনই, যখন এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং নেতিবাচক কাজে এর ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। স্মার্টফোন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সহজ করলেও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আজ এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ আজ এই যন্ত্রের প্রতি এমনভাবে মোহাবিষ্ট যে, ফোন হাতের কাছে না থাকলে তারা চরম মানসিক অস্বস্তিতে ভুগছে। মূলত এই আসক্তি মানুষের অমূল্য সময় ও মেধার এক নীরব ঘাতক। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা এই সর্বগ্রাসী স্মার্টফোন আসক্তির কারণ, এর বহুমুখী ক্ষতিকর প্রভাব এবং ইসলামী অনুশাসন ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এর থেকে পরিত্রাণের কার্যকরী উপায়গুলো তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

স্মার্টফোন আসক্তি ও নোমোফোবিয়া : অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহারের এক চরম নেতিবাচক পরিণতি হ'ল 'নোমোফোবিয়া' বা 'নো মোবাইল ফোন ফোবিয়া'। সহজ কথায় মোবাইল ফোন হাতের কাছে না থাকা, হারিয়ে যাওয়া, চার্জ শেষ হওয়া কিংবা ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মানুষের মনে যে তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, তাকেই নোমোফোবিয়া বলা হয়। এই মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি ফোনটিকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে পারেন না এবং অবচেতনভাবেই সবসময় তা ব্যবহারের সুযোগ খোঁজেন। আসক্তির এই মাত্রা কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, তা সাম্প্রতিক কিছু পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মানুষের দৈনিক গড় স্ক্রিন টাইম প্রায় ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। তরুণ ও কিশোরদের ক্ষেত্রে এই হার দিনে গড়ে ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা। এর মধ্যে তাদের জীবনের মূল্যবান ৪ থেকে ৫ ঘণ্টাই ব্যয় হয় শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে।[১]

স্মার্টফোন আসক্তির কারণ

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্মার্টফোন আসক্তি কখনো কখনো মাদকাসক্তির মতোই ভয়াবহ ও ক্ষতিকর হ'তে পারে। মানুষের মধ্যে স্মার্টফোনের প্রতি এই তীব্র আসক্তি তৈরি হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। নিম্নে এর বিশেষ কারণগুলো তুলে ধরা হ'ল—

১. সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন : বর্তমান অনলাইন সাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারী যথাসম্ভব অতিরিক্ত সময় স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে থাকতে পসন্দ করে। এর পেছনে কাজ করে এক ধরনের অত্যাধুনিক অ্যালগরিদম (Algorithm)[২]। এটি ব্যবহারকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করে তার পসন্দ অনুযায়ী কনটেন্ট বারবার দেখায়। যেমন ব্যক্তি কি ভিডিও দেখছে, কোন পোস্টে বেশী সময় দিচ্ছে, কি লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার করছে, কোন ধরনের কনটেন্টে বারবার ফিরে যাচ্ছে এই তথ্য বিশ্লেষণ করে সিস্টেম এমন কনটেন্ট সাজেস্ট করে যা ব্যক্তির আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে ব্যবহারকারী নিজের অজান্তেই আরও বেশী স্ক্রল করতে থাকে। এটিকে অনেক সময় বলা হয় Infinite scroll effect, যেখানে শেষ বলে কিছু নেই। শুধু নতুন কনটেন্ট আসতেই থাকে। এই অতিরিক্ত কন্টেন্ট মানুষের মস্তিষ্কে সাময়িক আনন্দ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'ডোপামিন নিঃসরণ' হিসাবে পরিচিত। এই ক্ষণস্থায়ী ভাল লাগার অনুভূতি মানুষকে বারবার ফোনের দিকে টেনে নেয়। ধীরে ধীরে মানুষ বাস্তব জীবনের চেয়ে ভার্চুয়াল স্বীকৃতির প্রতি বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ও স্ক্রীনের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়।

২. একাকীত্ব ও মানসিক চাপ : বিখ্যাত স্বাস্থ্যবিষয়ক সাময়িকী 'দ্য ল্যানসেট'-এর তথ্যমতে, বর্তমানে বিশ্বের ১২০ কোটিরও বেশী মানুষ কোন না কোন মানসিক রোগে ভুগছেন। এর মধ্যে মানসিক বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ সবচেয়ে বেশী।[৩] আধুনিক মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী এই মানসিক চাপ ও একাকীত্ব থেকে সাময়িক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই স্মার্টফোন আসক্তির অন্যতম প্রধান অনুঘটক। বাস্তব জীবনের সমস্যা থেকে পালাতে মানুষ অবচেতনভাবেই স্মার্টফোনের ভার্চুয়াল জগতে আশ্রয় নেয়, যা একধরনের 'পলায়নবৃত্তি' বা 'এসক্যাপিজম'। সোশ্যাল মিডিয়ার লাইক-কমেন্ট একাকীত্বে ভোগা মানুষদের মনে অন্যের সাথে যুক্ত থাকার এক ছদ্ম-সামাজিকীকরণ বা মোহ তৈরী করে। স্ক্রলিংয়ের সময় মস্তিষ্কে নিঃসৃত ডোপামিনস ক্ষণিকের জন্য মানসিক চাপ কমালেও, এর প্রভাব কাটা মাত্রই বাস্তব জগতের শূন্যতা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তখন সেই শূন্যতা ঢাকতে মানুষ পুনরায় দীর্ঘ সময়ের জন্য স্ক্রিনে ডুবে যায়। আর এভাবেই সাময়িক মুক্তির এই চেষ্টা এক ভয়াবহ ও স্থায়ী আসক্তিতে রূপ নেয়।

৩. সুস্থ বিনোদনের অভাব ও অনলাইন গেমের ফাঁদ : বর্তমান সময়ে আগের মতো খোলা মাঠে খেলাধুলা, পারস্পরিক আড্ডা বা শারীরিক পরিশ্রমমূলক সুস্থ বিনোদনের সুযোগ ও পরিসর অনেকটাই সংকুচিত হয়ে গেছে। কংক্রিটের বদ্ধ জীবন ও যান্ত্রিক ব্যস্ততার কারণে মানুষের বিনোদন এবং সামাজিক যোগাযোগের একমাত্র সহজলভ্য আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে হাতের ছোট্ট স্মার্টফোনটি। আর এই সুযোগেই পাবজি, ফ্রি-ফায়ার, কল অব ডিউটির মতো অনলাইন গেমগুলো ব্যবহারকারীর মনোযোগ সহজেই কেড়ে

* *শিক্ষার্থী, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।*

১. *www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db513.htm*

২. *অ্যালগরিদম (Algorithm) হ'ল কোন নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করার জন্য ধাপে ধাপে সাজানো নির্দেশনা বা নিয়মের সমষ্টি। সহজভাবে বলতে গেলে, কোন কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে সম্পন্ন করা হবে, সেই পরিকল্পিত ধাপগুলোকেই অ্যালগরিদম বলা হয়।*

৩. *https://surl.li/lvxfet*

নিচ্ছে। ফলে ব্যবহারকারী অজান্তেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রিনের সামনে কাটিয়ে দেয়, যা একপর্যায়ে স্মার্টফোনের স্বাভাবিক ব্যবহারের গণ্ডি পেরিয়ে প্রচণ্ড আসক্তিতে পরিণত হয়।

৪. ভাইরাল সংস্কৃতি ও সস্তা জনপ্রিয়তা : ডিজিটাল যুগে 'ভাইরাল' হওয়া যেন একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামে অল্প সময়ে বেশী ভিউ, লাইক ও ফলোয়ার পাওয়াকে অনেকেই সাফল্য বা জনপ্রিয়তার মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করছে। ফলে অনেকে গভীর চিন্তা, সৃজনশীলতা বা জ্ঞানের পরিবর্তে সহজ ও তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা অর্জনের পথে ঝুঁকে পড়ছে। এই ভাইরাল সংস্কৃতির কারণে অনেক ব্যবহারকারী এমন কনটেন্ট তৈরি বা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় যা দ্রুত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও তা সবসময় মানসম্মত বা অর্থবহ হয় না। ফলে তা ধীরে ধীরে আসক্তির পথে নিয়ে যায়।

৫. পরিবারিক অসচেতনতা : পরিবার থেকেই শিশুর প্রযুক্তি ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে ওঠে। অনেক অভিভাবক সন্তানকে শান্ত রাখার জন্য খুব অল্প বয়সেই স্মার্টফোন হাতে তুলে দেন। আবার বর্তমানে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে স্মার্টফোন। অনলাইন ক্লাস, ই-বুক, শিক্ষামূলক ভিডিও, তথ্য অনুসন্ধান ও যোগাযোগের জন্য শিক্ষার্থীরা স্মার্টফোন ব্যবহার করে। পড়াশোনার উদ্দেশ্যে ফোন হাতে নেওয়ার পর অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়া, গেম, শর্ট ভিডিও বা অপ্রয়োজনীয় ব্রাউজিংয়ে জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। ফলে অজান্তেই শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে কম-বেশী প্রায় সবাই স্মার্টফোনে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

৬. অনলাইন মাদক ও জুয়া : বাংলাদেশে শতাধিক অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ জুয়া খেলেন।[৪] স্মার্টফোনের সহজলভ্যতার কারণে বর্তমানে অনলাইন জুয়া, বেটিং, ক্ষতিকর গেম এবং মাদকসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কনটেন্ট তরুণদের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। অনেকেই প্রথমে কৌতূহলবশত এসবের সাথে জড়িয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে তা ভয়ংকর আসক্তিতে পরিণত হয়। অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে দ্রুত ও অধিক লাভের প্রলোভন মানুষকে দীর্ঘসময় ফোনে আটকে রাখে।

৭. হাইপার-কানেক্টিভিটি : বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনে ই-মেইল হোয়াটসঅ্যাপ, ইমু, মেসেঞ্জার ইত্যাদি মেসেজিং অ্যাপগুলোতে সবসময় অ্যাকটিভ থাকার একটি অলিখিত সামাজিক ও পেশাগত চাপ রয়েছে। দ্রুত রিপ্লাই না দিলে ক্ষতি হ'তে পারে, এমন অদৃশ্য উদ্বেগের কারণে মানুষ সারাক্ষণ ফোন চেক করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রয়োজনে ফোন হাতে নিলেও নোটিফিকেশনের ফাঁদে পড়ে মানুষ অবচেতনভাবেই অন্য অ্যাপে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। সবসময় যুক্ত থাকার এই বাধ্যবাধকতা ও মানসিক চাপই স্মার্টফোন আসক্তির অন্যতম বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৮. মনোযোগের স্থায়িত্ব হ্রাস : ছোট ছোট রিলস বা শর্ট ভিডিও মানুষের মস্তিষ্কের মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। ফলে দীর্ঘ কোন কাজ বা পড়াশোনায় মন বসানো কঠিন হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্ক সহজ বিনোদনের জন্য বারবার ফোনের দিকেই ফেরে।

স্মার্টফোনে আসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব

মাত্রাতিরিক্ত কোন কিছুই কখনো সুফল বয়ে আনে না। ঠিক তেমনি স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারকেও মোটেই হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে স্মার্টফোনের এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নিম্নে স্মার্টফোন আসক্তির মারাত্মক কিছু ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হ'ল।-

১. শিক্ষা জীবনে নেতিবাচক প্রভাব : স্মার্টফোন আসক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীরা। একাধিক গবেষণার উদ্বেগজনক তথ্যমতে, বাংলাদেশের প্রায় ৮৬% প্রি-স্কুলগামী শিশু স্মার্টফোনে আসক্ত এবং স্কুলগামী শিশুরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩ ঘণ্টা স্মার্টফোনে সময় কাটায়। যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সীমার চেয়ে অন্তত তিন গুণ বেশী। ব্যবহারের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিশুদের মধ্যে ৭৯% কার্টুন দেখার জন্য, ৪৯% গেম খেলার জন্য এবং ৪৫% ভিডিও দেখা বা গান শোনার কাজে ফোন ব্যবহার করে। অথচ পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করে মাত্র ১৪% শিশু।[৫] অনুরূপভাবে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও স্মার্টফোন ব্যবহার করে। এর ফলে তারা দীর্ঘসময় পড়ালেখায় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। অনেক শিক্ষার্থী গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট বা পরীক্ষার প্রস্তুতির পরিবর্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল ব্যবহার করে মূল্যবান সময় নষ্ট করে। এতে একদিকে যেমন তাদের সৃজনশীলতা কমে যায় ও পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হয়, তেমনি ধীরে ধীরে তারা প্রকৃত জ্ঞানার্জনের প্রতিও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

২. সময় অপচয় ও বেকারত্ব বৃদ্ধি : স্মার্টফোন মানুষের জীবনের মূল্যবান সময় নীরবে গ্রাস করে নিচ্ছে। এতে প্রাত্যহিক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো পিছিয়ে যায়। কর্মজীবী মানুষদের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তাদের কাজের প্রতি মনোযোগ কমে যায় এবং উৎপাদনশীলতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব মানুষকে ক্রমান্বয়ে অলস ও দায়িত্বহীন করে তোলে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সমাজে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

৩. শারীরিক সমস্যা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি : স্মার্টফোন আসক্তি মানবদেহে দীর্ঘস্থায়ী ও মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকার ফলে চোখের জ্যোতি কমে যাওয়া এবং ঝাপসা দেখার সমস্যা তৈরি হয়। একটানা ভুল ভঙ্গিতে ব্যবহারের কারণে ঘাড়, কাঁধ ও মেরুদণ্ডের তীব্র ব্যথা

---

৪. *দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৫।* *https://www.prothomalo.com/technology/70govsb667*

৫. *দৈনিক ইত্তেফাক, সেপ্টেম্বর ২০২৫।* *www.ittefaq.com.bd/753926.*

দেখা দেয়। অতিরিক্ত ইয়ারফোন ব্যবহারে কানে কম শোনার প্রবণতা বাড়ে। পকেটে রাখা মোবাইলের ক্ষতিকর রেডিয়েশনের প্রভাবে পুরুষদের শুক্রাণু কমে যাওয়ার মতো প্রজনন স্বাস্থ্যঝুঁকিও তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে স্ক্রিনের নীল আলোর প্রভাবে ঘুমের স্বাভাবিক চক্র ব্যাহত হয়ে মারাত্মক অনিদ্রা দেখা দেয়। অপর্যাপ্ত ঘুম ও আসক্তির কারণে মানুষের মেজায খিটখিটে হয়ে যায় এবং মস্তিষ্কের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়ায় স্থূলতা ও হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ছে। এককথায় স্মার্টফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানুষকে ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতাহীন ও অসুস্থ করে তুলছে।

৪. মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি : আইসিডিডিআরবি-এর এক গবেষণায় দেখা যায়, অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারকারী শিশুদের পাঁচটি প্রধান মানসিক সমস্যা দেখা দেয় তা হ'ল, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা বা মন খারাপের প্রবণতা, একাকীত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, মনোযোগের ঘাটতি এবং অতিরিক্ত রাগ বা বিরক্তি।[৬] এ সমস্যাগুলো শুধু শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কমবেশী সকল বয়সের মানুষের মাঝেই দেখা যায়। এছাড়াও অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার মানুষের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় এবং মানসিক চাপ বহুগুণে বৃদ্ধি করে। এর ফলে মানুষ বাস্তব জীবনে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। খুব সামান্য কারণেই তারা হতাশ হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিকতাও তৈরি হ'তে পারে। এছাড়াও সারাক্ষণ স্ক্রিনে ডুবে থাকার কারণে সৃজনশীল চিন্তাশক্তি হ্রাস পায় এবং মানসিক আতঙ্ক বা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়।

৫. পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি : স্মার্টফোনে অতিরিক্ত সময় দেওয়ার কারণে মানুষ পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কগুলোও দিনদিন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে বসেও প্রত্যেকে নিজ নিজ মোবাইলে ব্যস্ত থাকে। ফলে আন্তরিক আলাপচারিতাও কমে যায়। বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কগুলোও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। বৈষয়িক জীবনের আবেগ ও অনুভূতির পরিবর্তে মানুষ ভার্চুয়াল প্রতিক্রিয়ার উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে উঠছে।

৬. নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় : ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের অপব্যবহার অনেককে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে ঠেলে দেয়। অশ্লীল কনটেন্ট দেখা, গুজব ছড়ানো, সাইবার বুলিং, প্রতারণা ও মিথ্যা তথ্য প্রচারের মতো কাজের প্রবণতা বাড়ে। তরুণ সমাজের মধ্যে শালীনতা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়, যা সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ের জন্যই ক্ষতি বয়ে আনে।

৭. সৃজনশীলতা ও চিন্তাশক্তি হ্রাস : অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা কমে যায়। কারণ মানুষ ধীরে ধীরে সবকিছুর জন্য প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অবসর সময়ে বই পড়া, গবেষণা করা ও নতুন কিছু শেখার পরিবর্তে তারা বিনোদনমূলক কনটেন্টে অধিক সময় ব্যয় করে। এতে মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

৮. অশ্লীলতার প্রসার : ইন্টারনেট সুবিধার মাধ্যমে যে কেউ খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ছবি, ভিডিও ও কনটেন্টে প্রবেশ করতে পারে। অনেক সময় অজান্তেই বা কৌতূহলবশত এসব কনটেন্ট দেখা শুরু হ'লেও পরে তা আসক্তিতে পরিণত হয়। এ ধরনের কনটেন্ট মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে কিশোর ও তরুণ বয়সে এটি মানসিক বিকৃতি, ভুল ধারণা এবং অনৈতিক আচরণের প্রবণতা সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তির শালীনতা, লজ্জাবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৈষয়িক জীবনের সম্পর্কের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়।

৯. সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা হ্রাস : যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, স্মার্টফোন আসক্তি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক সক্ষমতায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা মানুষের সৃজনশীল কাজে চরম বিঘ্ন ঘটায়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, স্মার্টফোনে আসক্ত ব্যক্তিদের সৃজনশীল কাজ করার সময় মস্তিষ্কের 'প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স' ও 'টেম্পোরাল এরিয়া' তেমন সক্রিয় থাকে না।[৭] এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে কোন সমস্যার মুখোমুখি হ'লে নিজে গভীরভাবে চিন্তা করে সমাধান বের করার পরিবর্তে মানুষ এখন তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটের সাহায্য নিচ্ছে। ফলে মস্তিষ্কের নিজস্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতা, চিন্তার গভীরতা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

স্মার্টফোন আসক্তি থেকে পরিত্রাণের উপায়

সচেতনতা ও কিছু সঠিক অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে স্মার্টফোন আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। প্রথমেই ফোনে থাকা অ্যাপগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১. প্রয়োজনীয় ও সহায়ক অ্যাপ যেমন: ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, ডায়ালার, অভিধান, কন্টাক্ট, লেনদেন ইত্যাদি ২. সময় নষ্ট করে এমন অ্যাপ যেমন: সোশ্যাল মিডিয়া- ফেসবুক, ইউটিউব, ম্যাসেঞ্জার, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার, ইমো, গেমস ইত্যাদি। ২নং ধারার অ্যাপগুলোর ক্ষেত্রেই বেশী আসক্তি তৈরী হয়। আর এসব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কিছু কার্যকর উপায় হ'তে পারে নিম্নরূপ :

১. সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা : প্রথমেই আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন হ'তে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত অমূল্য নে'মত এই সময়কে কেবল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দু'টি নে'মতের ব্যাপারে বহু মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। আর তা হ'ল সুস্থতা ও অবসর'।[৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান ব্যতীত কোন আদম সন্তানের পা এক কদমও

৬. ডেইলী স্টার, ২২ মে ২০২৬, https://shorturl.at/IYodd

৭. দৈনিক প্রথম আলো, ২৮শে নভেম্বর ২০২২, www.surl.li/kkomai

৮. বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫।

নড়বে না। যার অন্যতম হ'ল– 'সে তার জীবনের মূল্যবান সময় কোন পথে ব্যয় করেছে'।[৯] উপরোক্ত হাদীছদ্বয় থেকে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল, জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ডের হিসাব মহান আল্লাহ্র নিকট প্রদান করতে হবে। তাই স্মার্টফোন আসক্তিতে অমূল্য সময় নষ্ট করা থেকে আমাদের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

২. ভালো কাজে ব্যস্ত থাকা : কাজের মধ্যে লেগে থাকার সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি আপনাকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করে এবং নতুন কোন দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। আপনি যখন কোন বাস্তব বা সৃজনশীল কাজে (যেমন: পড়ালেখা, ফ্রিল্যান্সিং, হাতের কাজ বা ব্যায়াম) নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, তখন আপনার মস্তিষ্ক ফোনের ভার্চুয়াল দুনিয়া থেকে মনোযোগ সরিয়ে বাস্তব অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করে। এই প্রক্রিয়াটি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় এবং অলস সময়ে ফোনের স্ক্রিনে অযথা স্ক্রোল করার ক্ষতিকর অভ্যাস কমিয়ে আনে।

৩. পরিবারে সময় দেওয়া ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা : স্মার্টফোন আসক্তির কারণে বর্তমানে অনেক পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং মানুষ ধীরে ধীরে পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই পরিবার ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা স্মার্টফোন আসক্তি থেকে মুক্তির একটি কার্যকর উপায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক প্রশান্তি ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। একসঙ্গে খাবার খাওয়া, গল্প করা, সফরে যাওয়া বা পারিবারিক আলোচনায় অংশ নেওয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। এতে মানুষ ভার্চুয়াল জগতের কৃত্রিম আনন্দের পরিবর্তে বৈষয়িক জীবনের সত্যিকারের সুখ অনুভব করতে শেখে। এছাড়া সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক দক্ষতা উন্নত করে।

৪. খেলাধুলা ও শরীরচর্চা : স্মার্টফোন আসক্তি থেকে মুক্ত থাকার অন্যতম কার্যকর উপায় হ'ল নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করা। বর্তমানে অনেক মানুষ অবসর সময় মাঠে খেলাধুলা বা শারীরিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার পরিবর্তে মোবাইলের স্ক্রিনে সময় কাটায়। ফলে শরীর ও মন উভয়ই ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। দৌড়-ঝাঁপ, ব্যায়াম বা বিভিন্ন ধরনের নির্দোষ খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরের রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে এটি মানসিক প্রশান্তি ও আনন্দ প্রদান করে। নিয়মিত শরীরচর্চা মানুষের ক্লান্তি, মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে, যা স্মার্টফোনের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৫. স্ক্রিন টাইম বা অ্যাপ লিমিট ব্যবস্থা : এই ব্যবস্থাগুলোর মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী প্রতিদিন কত সময় মোবাইল ব্যবহার করছে তা সহজেই জানতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করতে পারে। 'Digital Wellbeing' বা 'Screen Time' নামক ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারী বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহারের সময় নির্ধারণ করতে পারে। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায় বা সতর্কবার্তা দেয়। এসব অ্যাপ ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া, গেম বা বিভ্রান্তিকর অ্যাপ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

৬. ঘুমের সময় মুঠোফোন দূরে রাখা : অনেকেই ঘুমের সময় মুঠোফোন কাছাকাছি রাখেন। যা স্বাস্থ্যঝুঁকির একটি বড় কারণ। এ অভ্যাস বাদ দিতে হবে। প্রয়োজনে মুঠোফোন সাইলেন্ট করে ঘুমানোর জায়গা থেকে দূরে রাখতে হবে।

৭. কঠিন আনলক পদ্ধতি : মুঠোফোনের আনলক পদ্ধতি কঠিন করতে হবে। প্রয়োজনে মুঠোফোনের টাচ আইডি বা ফেইস আইডি সুবিধা বন্ধ রাখতে হবে। খোলার পদ্ধতি কঠিন হ'লে বারবার আনলক করে মুঠোফোন ব্যবহার করতে মন চাইবে না।

৮. সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ লুকানো : যারা ফেসবুক, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, ইমো বা ইমেইলের মতো অ্যাপগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার থেকে নিজেকে কিছুতেই বিরত রাখতে পারছেন না, তারা একটি কৌশল হিসাবে অ্যাপগুলো চোখের আড়াল করে রাখতে পারেন। এজন্য অ্যাপগুলোকে স্মার্টফোনের হোম স্ক্রিন থেকে সরিয়ে আলাদা কোন ফোল্ডারে বা পেছনের স্ক্রিনে রাখতে হবে। চোখের সামনে না থাকলে এগুলো ব্যবহারের প্রতি মস্তিষ্কের যে অবচেতন আকর্ষণ তৈরি হয় তা অনেকটাই হ্রাস পাবে।

৯. স্ক্রিন ফ্রি সময় : সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোবাইল থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত কয়েক ঘণ্টা ফোন ব্যবহার বন্ধ রাখলে মস্তিষ্ক কিছুটা বিশ্রাম পায় এবং ভার্চুয়াল জগতের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ কমতে শুরু করে। শোবার ঘর ও খাবার টেবিলে ফোন ব্যবহার কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে।

১০. অবসরের সঠিক ব্যবহার : ছুটির দিন, অফিসের বিরতি বা অবসর হ'ল ফোন ব্যবহার করার উর্বর সময়। অবসরেও ফোনের প্রতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে হবে। এ সময়গুলোতে মোবাইল ব্যবহার না করে শিক্ষামূলক বা অন্যান্য সৃজনশীল কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

উপসংহার : স্মার্টফোনের লাগামহীন অপব্যবহার মানবজীবনের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে করোনা মহামারীর সময় মানুষ যখন দীর্ঘকাল গৃহবন্দী ছিল, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সবাই এই যন্ত্রের নিবিড় সংস্পর্শে আসে। মূলত সেই সময় থেকেই স্মার্টফোন আসক্তির এই ব্যাধি সমাজে আরও প্রকটভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। যার তিক্ত পরিণতি আজ আমরা পদে পদে উপলব্ধি করছি। তাই কেবল প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কাজেই স্মার্টফোনের সীমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রত্যেকের জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই এই সর্বগ্রাসী আসক্তি থেকে আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

৯. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; ছহীহাহ হা/৯৪৬।

সন্তান আমার আয়না

*-জাহিদ হাসান**

হে শ্রদ্ধেয় পিতা, হে স্নেহময়ী মাতা! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেওয়া সবচেয়ে সুন্দর আমানতটি আজ আপনার ঘরে হাসছে, খেলছে। সেই কোমল শিশুটি, যার প্রতিটি নিঃশ্বাসে আপনার হৃদয় দুলে ওঠে। সে কেবল আপনার সন্তান নয়, সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার কাছে গচ্ছিত এক পবিত্র আমানত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' *(আত-তাহরীম ৬৬/৬)*।

এই আয়াতে আল্লাহ কেবল নিজেকে রক্ষার কথা বলেননি, বলেছেন পরিবারকেও রক্ষার কথা। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আমরা কি সেই আমানত রক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছি? রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল এবং সে তার পরিবারের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।[১]

আপনি কি কখনো নিঝুম রাতে আপনার সেই নিষ্পাপ সন্তানটির ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন, সে কোন পথে হাঁটছে? আপনি কি তার কোমল হাত দু'টি ধরে জান্নাতের পথে এগিয়ে নিচ্ছেন, নাকি অজান্তেই ঠেলে দিচ্ছেন অন্ধকারের অতল গহ্বরে? আজ আমরা বড় আক্ষেপ করে বলি, আমাদের সন্তানরা দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে! কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, আমরা যা বলি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রতিফলন আছে কি-না? জনৈক সালাফী বিদ্বান বলেছিলেন, 'তোমাদের সন্তানরা তোমাদের কথার চেয়ে তোমাদের ছায়াকে বেশী অনুসরণ করে'। আজকের আলোচনায় আমরা পাঁচটি অন্ধকার দরজার কথা বলব, যেগুলো দিয়ে প্রতিদিন আমাদের সন্তানদের ঈমান ও আখলাক নিভে যাচ্ছে। অথচ দরজাগুলো খুলে রাখছি আমরা নিজেরাই।

প্রথম দরজা : মুছহাফের ধুলোবালি ও আমাদের অবহেলা

আপনি চান আপনার সন্তান আল-কুরআনের আলোয় আলোকিত হোক, তার বুক জুড়ে থাকুক আল্লাহ তা'আলার কালাম। কিন্তু হে সম্মানিত পিতা-মাতা! সেই সন্তান যখনই আপনার কক্ষের দিকে তাকায়, সে কী দেখে? সে দেখে তার পিতার চোখ দু'টি আটকে আছে একটি কৃত্রিম স্ক্রিনে, আঙুলগুলো অবিরাম স্ক্রল করে চলেছে দুনিয়ার অর্থহীন সব দৃশ্য। অথচ ঘরের এক কোণে, আলমারির উপর অবহেলায় পড়ে আছে আল্লাহ্র কিতাব, তাতে জমে আছে ধুলোর আস্তরণ।

কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, তা আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'মুমিন তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহ্র নাম শুনলে ভয়ে কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সামনে আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়' *(আনফাল ৮/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়'।[২]

আপনি যদি পিতা হিসাবে চান আপনার সন্তান আলেম হোক, তবে আপনাকে প্রথমে নিজেকে কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। কারণ সন্তান পিতার কর্ম দেখে বড় হয়, পিতার কথা শুনে নয়। যে সন্তান তার পিতাকে কখনো গভীর রাতে কুরআন বুকে জড়িয়ে কাঁদতে দেখেনি, যে মেয়ে তার মাকে দেখেনি পরম ব্যাকুলতায় আল্লাহ্র আয়াতের গভীরে ডুবে যেতে, সেই কোমল হৃদয়ে কুরআনের মহব্বত কিভাবে জন্মাবে? আমরা মুখে কুরআনের কথা বলি, কিন্তু আমাদের হাতজোড়া সঁপে দিয়েছি আধুনিক যন্ত্রপাতির কাছে। এটা কেবল গাফলতি নয়, বরং আমানতের খেয়ানত।

দ্বিতীয় দরজা : ছালাতের ডাক ও আমাদের অলসতার প্রহর

আর একটু ঘুমিয়ে নেই, অফিসের কাজটা শেষ করে নেই, ছালাত তো পরেও পড়া যাবে। এই ছোট ছোট বাক্যগুলো আমাদের নিজেদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। কিন্তু আমাদের সন্তানরা এই বাক্যগুলো তাদের আত্মার গভীরে খোদাই করে নেয়। আল্লাহ তা'আলা ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, 'সুতরাং দুর্ভোগ সেই ছালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের ছালাত সম্পর্কে উদাসীন' *(মা'ঊন ১০৭/৪-৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ছালাতের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে ছালাত না পড়লে তাদের প্রহার করো'।[৩]

কিন্তু এই হাদীছে প্রহারের আগে একটি শর্ত আছে, আর তা হ'ল পিতা-মাতা নিজে ছালাত আদায়কারী হওয়া। যে পিতা নিজে বেপরোয়াভাবে ছালাত ত্যাগ করেন, তিনি কি কখনো সন্তানকে ছালাতে অভ্যস্ত করতে পারবেন? যে পিতা নিজের সন্তানকে দ্বীনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখেন, তিনি তার সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেন। কারণ যে হৃদয়ে শিশুকাল থেকে দ্বীনের বীজ বোনা হয় না, সেখানে পরবর্তীতে দুনিয়ার আগাছা গজিয়ে ওঠে।

সে যখন দেখে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে, একটু আরামের ঘুমে কিংবা প্রিয় কোন কাজের বাহানায় তার আব্বা-আম্মা কত সহজে ছালাতকে পিছিয়ে দিচ্ছে বা অবহেলা করছে, তখন তার অবচেতন মন একটা জিনিস শিখে নেয় যে, ছালাতকে পেছনে ঠেলে দেওয়া যায়। পরবর্তীতে সেই সন্তান যখন বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মগ্ন থাকবে, আপনি তাকে কিভাবে বলবেন, ছালাতের সময় হয়েছে, আড্ডা ছাড়ো? সে তো তার প্রথম শিক্ষকের কাছ থেকেই শিখে এসেছে যে, দুনিয়ার আনন্দের কাছে ছালাতকে থামিয়ে রাখা যায়।

তৃতীয় দরজা : রাতের নিস্তব্ধতা ও আমাদের জাগরণ

আমরা অধিকাংশ অভিভাবক আক্ষেপ করি, আহা! আমাদের তরুণ সমাজ ফজর পড়তে পারে না, তাহাজ্জুদের স্বাদ জানে না। কিন্তু হে উম্মাহ্র অভিভাবক! একটু স্মৃতির পাতা

১. *বুখারী হা/৮৯৩; মুসলিম হা/১৮২৯।*

২. *বুখারী হা/৫০২৭।*

৩. *আবুদাঊদ হা/৪৯৫, সনদ ছহীহ।*

ওল্টান। আপনার সন্তান ছোটবেলা থেকে রাতের অন্ধকারে আপনাকে কি করতে দেখেছে? সে দেখেছে, নতুন বছরের সূচনালগ্নে সামান্য আতশবাজির রোশনাই দেখার জন্য কিংবা পর্দার ভেতরের কোন কাল্পনিক দুনিয়ায় ডুব দেওয়ার জন্য আপনি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে আছেন। কিন্তু সে কি কখনো দেখেছে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, যখন আরশের মালিক প্রথম আসমানে নেমে এসে ডাকতে থাকেন, তখন তার পিতা-মাতা মুছাল্লায় (জায়নামাযে) সিজদায় কাঁদছে?

রাসূলুল্লাহ (ছা.) জানিয়েছেন, 'আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে। তিনি বলেন, কে আমাকে ডাকছ, আমি তার ডাকে সাড়া দেব?'।[৪] যে জাগরণ কেবল দুনিয়ার বিনোদনের জন্য, তা কখনো সন্তানের অন্তরে তাহাজ্জুদের তৃষ্ণা জাগাতে পারে না।

সালাফদের মায়েরা কিভাবে সন্তান গড়তেন, তার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত দেখুন। ইমাম আহমাদ (রহ.) শৈশবেই পিতৃহারা হন। তাঁর মা ছাফিয়্যাহ বিনতে মায়মূনা (রহ.) চরম দারিদ্রের মধ্যেও এক হাতে ছেলেকে মানুষ করেছিলেন। ভোররাতে যখন চারদিক অন্ধকার থাকত, তখন তিনি পরম মমতায় সন্তানকে ঘুম থেকে তুলতেন, ওযূ করিয়ে দিতেন এবং তীব্র শীতের মধ্যেও মাদ্রাসায় বা ইলমের মজলিসে নিয়ে যেতেন। পথের অন্ধকার ও একাকীত্ব দূর করতে তিনি ছেলেকে বলতেন, 'বৎস! তুমি এগিয়ে যাও, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে আমানত হিসাবে সোপর্দ করলাম'। মায়ের এই গভীর ঈমান ও দূরদর্শিতাই পরবর্তীকালে ইমাম আহমাদকে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম এবং আহলুস সুন্নাহ্‌র আলোকবর্তিকা হিসাবে গড়ে তুলেছিল।

চতুর্থ দরজা : সুন্নাহ্‌র সুবাসহীন এক কৃত্রিম জীবন

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর সুন্নাহ কেবল বাহ্যিক কিছু লেবাসের নাম নয়। সুন্নাহ হ'ল তাঁর অনুপম চরিত্র, তাঁর সততা, তাঁর অমায়িক ব্যবহার, তাঁর ঘরের মানুষদের সাথে সদাচার। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছা.) সম্পর্কে বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*। আয়েশা (রাঃ)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রাসূল (ছা.)-এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেছিলেন, 'তাঁর চরিত্রই ছিল কুরআন'।[৫]

কিন্তু আমাদের একি অদ্ভুত দ্বিমুখীতা! আমরা সন্তানকে নছীহত করি, কখনো মিথ্যা বলো না। অথচ একটু পরেই দরজায় কোন পাওনাদার এলে আমরা সন্তানকে ইশারা করে বলি, যাও বলে আস, আব্বা ঘরে নেই। ঘরের ভেতরে স্ত্রীর সাথে আমাদের আচরণ কর্কশ, প্রতিবেশীর সাথে আমাদের সম্পর্ক হিংসা-বিদ্বেষে ভরা। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সততা পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। আর মানুষ সত্য বলতে বলতে আল্লাহ্‌র কাছে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়'।[৬]

সালাফদের অনেকেই বলতেন, ইলমের আগে আদব শেখো। কারণ আদব ছাড়া ইলম মানুষকে আরও অহংকারী করে। এই যে আমাদের কথার সাথে কাজের দূরত্ব, এই দৃশ্যটি সন্তানের কোমল মনকে বিষিয়ে তোলে। তারা দ্বীনকে তখন এক ধরনের অভিনয় মনে করতে শুরু করে, যা মুখে বলা হয়, কিন্তু জীবনে পালন করা হয় না।

পঞ্চম দরজা : দুনিয়ার ইঁদুর দৌড় ও আখেরাতের শূন্যতা

এই প্রসঙ্গের শুরুতে একটি গল্প বলা যাক। ধরুন, আপনি আপনার সন্তানকে একটি রাজকীয় জাহাযে তুলে দিলেন। জাহাজের ভেতর সুইমিং পুল আছে, থ্রি-ডি সিনেমা হল আছে। আছে পৃথিবীর সবচাইতে সুস্বাদু খাবারের আয়োজন। সন্তানকে বিদায় জানানোর সময় আপনি তাকে বারবার মনে করিয়ে দিলেন, কিভাবে চামচ দিয়ে স্যুপ খেতে হয়, কিভাবে টাই বাঁধতে হয়, আর কিভাবে লাইনের সবার আগে গিয়ে ফার্স্ট ক্লাস কেবিনটা দখল করতে হয়। কিন্তু খুব ছোট্ট একটি জিনিস আপনি তাকে বলতে ভুলে গেলেন। আপনি তাকে বললেনই না যে, জাহাজটার গন্তব্য কোথায়! আপনি তাকে শেখালেন না যে, ঝড় এলে কিভাবে লাইফ জ্যাকেট পরতে হয়, জাহাজ যদি কোনদিন ডুবে যায় তবে কিভাবে বাঁচতে হয়। আমরা কি আমাদের সন্তানদের সাথে ঠিক এই কাজটাই করছি না?

আমাদের সকালগুলো আজকাল কেমন যেন যান্ত্রিক। ঘুম থেকে উঠেই আমাদের ডাইনিং টেবিলের গল্পগুলো শুরু হয় লাভ আর ক্ষতির নিখুঁত হিসাব দিয়ে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমরা গল্প করি, অমুকের ছেলেটা এবার গোল্ডেন এ-প্লাস পেয়েছে, তমুকের পিতা অমুক জায়গায় পাঁচ কাঠা জমি কিনেছে, অমুক কোম্পানির সিইও-র বেতন নাকি প্রতি মাসে কয়েক লাখ টাকা! আমাদের কচি সন্তানটি যখন এক কোণে বসে নাশতা খেতে খেতে পিতা-মাতার এই মোহময় আলোচনা শোনে, তখন তার অবচেতন মন খুব নীরবে একটি মারাত্মক বার্তা গ্রহণ করে। সে শিখে নেয়, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ও সফল হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হ'ল টাকা, ক্ষমতা আর জিপিএ-৫!

সন্তানের জিপিএ-৫ নিশ্চিত করার জন্য, তাকে কোন ভালো কোচিংয়ে ভর্তি করানোর জন্য আমরা পিতা-মাতারা রাতের পর রাত জেগে থাকি। আমাদের চোখে ঘুম থাকে না, কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। অথচ সেই সন্তানটা রাতে এশার ছালাত না পড়েই ঘুমিয়ে গেল কি-না, তার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা আর জাহান্নামের ভয় ঢুকল কি-না তা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তার দুনিয়ার ক্যারিয়ারের জন্য আমরা যতটা বিনিদ্র রজনী কাটাই, তার আখেরাত গড়ার জন্য আমরা তার এক শতাংশও করি না। হায় আক্ষেপ!

** সহকারী শিক্ষক, শান্তি নিকেতন ইন্সটিটিউট, ফেনী।*
৪. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮।
৫. মুসলিম হা/৭৪৬।
৬. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই ভয়ংকর মানসিকতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কত চমৎকার করেই না সতর্ক করেছেন! 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*। এই যে কে কার চেয়ে বেশী টাকা কামাবে, কে কত বড় বাড়ী বানাবে, এই ইঁদুর দৌড় খেলতে খেলতেই একদিন হঠাৎ আমাদের সামনে মালাকুল মঊত এসে পড়েন। আমরা টেরই পাই না যে আমাদের সময় শেষ! আমরা ভাবি, ব্যাংকে কোটি টাকা আর দামী গাড়ি থাকলেই বুঝি জীবন সফল। অথচ আমাদের প্রিয় নবী (ছা.) সুখের সংজ্ঞা দিয়েছেন একদম অন্যভাবে। তিনি বলেছেন, 'সম্পদের প্রাচুর্যে ধনী হওয়া যায় না, বরং ধনী হ'ল সেই হৃদয়, যা আত্মিকভাবে সমৃদ্ধ'।[৭] যে হৃদয়ে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল আছে, যে হৃদয়ে আখেরাতের তৃষ্ণা আছে, সেই তো প্রকৃত ধনী।

হাসান বাছরী (রহ.) চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন। কথাটি শুনলে গা শিউরে ওঠে। তিনি বলেছিলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি তো আর কিছুই নও, তুমি হ'লে কেবল কতগুলো দিনের সমষ্টি। তোমার জীবন থেকে যখন একটি দিন চলে যায়, মনে রেখো, তোমার অস্তিত্বের একটি বড় অংশই চিরতরে হারিয়ে যায়'। তাহ'লে ভাবুন তো, আমাদের জীবনের এই যে দিনগুলো চলে যাচ্ছে, সেগুলো কি আমরা আল্লাহ্র স্মরণে কাটাচ্ছি, নাকি স্রেফ একটি অন্ধ দুনিয়ার পেছনে ছুটে পার করে দিচ্ছি? যখন আমাদের পুরো জীবনটা জুড়ে কেবল দুনিয়ার জাঁকজমক, ব্যাংকের ব্যালেন্স আর মানুষের বাহবা পাওয়ার সাধনা প্রকাশ পায়, তখন আমাদের সন্তানের কচি মনে আখেরাতের আকাঙ্ক্ষা কিভাবে তৈরি হবে? সে তো আমাদের দেখেই বড় হচ্ছে। সে ধরে নেয়, এই চার দেয়ালের পৃথিবীর সমৃদ্ধিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এর বাইরে যে একটি অন্তহীন জীবন আছে, যেখানে আমাদের অনন্তকাল থাকতে হবে, সেটা তার কাছে তখন রূপকথার মতো মনে হয়।

হে সম্মানিত অভিভাবক! সন্তানকে দুনিয়ার ইঁদুর দৌড়ে প্রথম বানানোর আগে একবার ভাবুন, কবরের প্রথম রাতে যখন তাকে একা রেখে আসা হবে, তখন আপনার দেওয়া এই জিপিএ-৫ আর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির চাকরি কি তার কোন কাজে আসবে? যদি না আসে, তবে কেন আমরা তাদের আসল গন্তব্যের কথা ভুলে এই ক্ষণস্থায়ী জাহাজের চাকচিক্য নিয়ে এতটা ব্যস্ত? সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই চলুন, ওদের হাতটা ধরে জান্নাতের পথে হাঁটা শেখাই। সালাফদের যুগে মায়েরা তাদের সন্তানদের ঘুম থেকে জাগিয়ে বলতেন, হে বৎস! ওঠো, ছালাত আদায় করো। আমি চাই না হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র সামনে আমি লজ্জিত হই। তাঁরা মুখে যা বলতেন, তাঁদের চোখ, হাত আর হৃদয় তা-ই সাক্ষ্য দিত। তাই সেই সন্তানেরা হয়েছিল ইমাম, মুজাহিদ, আলেম; যাদের কথা আজও ইতিহাস বলে।

৭. *বুখারী হা/৬৪৪৬।*

অভিভাবক হিসাবে আমাদের করণীয়

সন্তানকে সালাফদের আদর্শে এবং নৈতিক মূল্যবোধে গড়ে তুলতে হ'লে কেবল মুখে বলাই যথেষ্ট নয়, বরং নিজেদের আচরণে তার প্রতিফলন ঘটানো যরূরী। আজ থেকেই আমরা আমাদের পরিবারে নিম্নের পাঁচটি সহজ অথচ অত্যন্ত প্রভাবশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।-

১. ঘরে কুরআনের পরিবেশ তৈরি করা : প্রতিদিন সন্তানের সামনে অন্তত ১৫-২০ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত করুন। আপনার তেলাওয়াত শুনে সন্তানের অন্তরেও আল্লাহ্র কালামের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে।

২. ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ : নিজে জামা'আতে ছালাত আদায়ের অভ্যাস করুন এবং মসজিদে বা ছালাতের ওয়াক্তে সন্তানকেও পরম মমতায় সাথে নিয়ে যান। এটি তাকে শৈশব থেকেই ছালাতের প্রতি অনুরাগী করবে।

৩. সালাফদের জীবনীর সাথে পরিচয় : সপ্তাহে অন্তত একটি দিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে বসুন। এই সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর সীরাত, ছাহাবী এবং সালাফদের অনুপ্রেরণামূলক জীবনী পাঠ করুন ও আলোচনা করুন।

৪. আদর্শ আচরণের মডেল হওয়া : সন্তানের সামনে মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা ও হিংসার মতো বদভ্যাসগুলো পুরোপুরি পরিহার করুন। মনে রাখবেন, সন্তান আমাদের মুখের কথার চেয়ে আমাদের আচরণ দেখে বেশী শেখে।

৫. দো'আর মাধ্যমে দিনের সমাপ্তি : প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে সন্তানকে কাছে বসিয়ে সংক্ষিপ্ত দো'আ করুন। আল্লাহ্র কাছে তাদের নেক নিয়ত, উত্তম চরিত্র ও হেদায়াতের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন।

আপনি নিজে তা-ই হয়ে উঠুন, যা আপনি আপনার সন্তানের মাঝে দেখতে চান। হে সম্মানিত পিতা! হে স্নেহময়ী মাতা! আল্লাহ আমাদের এই পবিত্র আমানত রক্ষা করার তাওফীক দান করুন। আমাদের সন্তানদের ক্বলব আলোকিত করুন কুরআনের নূরে। আমাদের ঘরগুলো হোক তাহাজ্জুদের কান্নায় মুখরিত, ছালাতের আযানে প্রকম্পিত ও সুন্নাহ্র সুবাসে সুরভিত।-আমীন।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

এডুকেশন বিজনেস

-সারওয়ার মিছবাহ

এডুকেশন বিজনেসের প্রচলিত ধারা : একবার এক কাছের লোক বললেন, এই যে বিভিন্ন অনলাইন কোচিং সেন্টার, এদের ইনকাম সম্পর্কে কোন ধারণা আছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এদের সারা বছর সর্বনিম্ন এতটি ব্যাচ চালু থাকে। প্রতিটি ব্যাচে এতজন শিক্ষার্থী থাকে। প্রতিজন শিক্ষার্থীদের কাছে এরা এতটাকা করে নেয়। এবার হিসাব কর। ক্যালকুলেটর ভেঙ্গে যাবে। শিক্ষক থাকে সর্বোচ্চ দশজন। স্টাফদের খরচাপাতি দিয়েও কত টাকা থাকে, হিসাব করতে পার? মাথায় ধরবে না যে, একটা কোচিং সেন্টার থেকে এতটাকা ইনকাম হ'তে পারে।

তার এই কথার সাথে আমিও পূর্ণ একমত। এডুকেশন বিজনেসের চেয়ে বড় বিজনেস হ'তে পারে না। কারণ এখানে এমন পণ্যের বিনিময়ে টাকা আসে, যা কখনো ফুরাবে না। এজন্যই এই ব্যবসা দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। কোনরকমে সিজন পার করলেই টাকা। এজন্য অনেকেই অন্যান্য ব্যবসার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রতি খুব আগ্রহী। আপনারাও হয়ত খেয়াল করেছেন, বড় বড় কোম্পানীগুলো তাদের মোটা বিনিয়োগ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে। সর্বাধিক উন্নত করার চেষ্টা করছে। কারণ প্রতিষ্ঠান যত উন্নত, শিক্ষার মান যত ভাল, ইনকাম তত বেশী।

দুনিয়ার বুকে একাডেমিক শিক্ষার শুরু ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়নি। কিন্তু মানুষ যখন দেখল, এটাও একটা সুন্দর ব্যবসাক্ষেত্র হ'তে পারে, তখন তারা সেই সুযোগকে কাজে লাগানো শুরু করল। সেখান থেকেই শিক্ষা-সেবা; শিক্ষা-বাণিজ্যতে বদলে গেল। সেই ধারাতে আজ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সবাই চাচ্ছে, বছর শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের বড় একটা আর্থিক লাভ থাকুক। এই আর্থিক লাভ-লোকসানের যাঁতাকলে প্রতিনিয়তই পিষ্ট হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা। যার প্রামাণ্যচিত্র আমাদের চোখের সামনে।

এই সিস্টেমে অভিভাবকগণ এসে শিক্ষকদের বলতে পারেন, এই সময় ক্লাস নিলেন কেন? এটা এভাবে পড়ালেন কেন? এত বেশী পড়া দেন কেন? প্রতিদিন লিখতে দেন কেন? দেরী করলে শাসন করেন কেন? ক্লাসে বেত নিয়ে যান কেন? কারণ তারা মনে করেন, আমরা টাকা দিয়ে পড়াচ্ছি। শিক্ষকদের পরিবার চলে আমাদের টাকায়। তারা আমাদের কথা শুনবে না মানে! তারা আমার সন্তানকে বকা দেবে, এটা তো হ'তেই পারে না। অনেকে তো সরাসরি মুখ খুলে এসব বলেও ফেলেন। বললেই আর কি! এই জিনিসগুলো যেন সবারই 'গা-সওয়া' হয়ে গেছে।

এই বাণিজ্যিক সিস্টেমে প্রতিটি অভিভাবকই একেকজন শিক্ষাবীদ। শিক্ষার্থীদের কোন বিষয় কিভাবে পড়াতে হবে, এটা তারা শিক্ষকদের চাইতে অনেক ভাল জানেন। অথচ এই অভিভাবকই যখন সন্তানের চিকিৎসা করাতে মেডিকেলে যান তখন বলতে পারেন না যে, এই টেস্ট লিখলেন কেন? এই ঔষধ লিখলেন কেন? তখন তাদের যদি বলা হয়, দুই ঘণ্টা বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে তারা হঠাৎই চরম আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠেন। ডাক্তার যখন ধমক দিয়ে বলেন, ডাক্তার কি আমি নাকি আপনি? তখন তারা চুপসে যান। কারণ তারা জানেন, রোগ না সারলে বাচ্চা মারা যাবে। কিন্তু এই বাচ্চাই যখন অনেক বছরের লেখাপড়া শেষে যখন মূর্খের মতই থেকে যায়, তখন তারা আতশ কাঁচ দিয়েও এর কারণ খুঁজে পান না।

এই সিস্টেমে শিক্ষকগণ কিন্তু ডাক্তারদের মত ধমক দিতে পারেন না। কারণ অভিভাবকদের মনে কষ্ট দিলে তারা বাচ্চা নিয়ে চলে যাবে। অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে। তবে আমার মনে হয়, মৌমাছির পায়ে তেল মালিশ করা ফুলের কাজ নয়। ফুলের কাজ নিজের মাঝে মধু সঞ্চয় করা। যদি মধু থাকে তবে এবেলা নাহয় ওবেলা মৌমাছি আসবেই। আর মৌমাছিতে বাগান ভরলে বাণিজ্য এমনিই হবে। তবে প্রচলিত যে বাণিজ্যের চিত্র দেখানো হ'ল আমরা এই বাণিজ্য চাই না। আমরাও চাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যবসা হোক। তবে সেই ব্যবসার ধরন ভিন্ন। সেটা বুঝতে আমরা একটু গোড়া থেকে শুরু করি। ক্যালকুলেটর ভাঙ্গা হিসাব আমরাও আপনাকে দেখাতে চাই।

নতুন মুদ্রা চিনি : দুনিয়ার বুকে আমরা সবাই ব্যবসায়ী। কেউ দুনিয়ার ব্যবসা করে, কেউ করে আখেরাতের ব্যবসা। ব্যবসার বাইরে কিছুই নেই। কেউ কাপড় তৈরী করে। কেউ খাবার তৈরী করে। কেউ তৈরী করে ভিন্ন কিছু। কেউ আবার এই কারখানাগুলোর বিভিন্ন পদে চাকুরী করে মনে করে, আমি ব্যবসা করি না। অথচ তারাও ব্যবসারই একেকটি অংশ। এখন এই কাপড়, খাবার ইত্যাদি জিনিসগুলো যাদের জন্য তৈরী করা হয় সেই মানুষ তৈরীও তো একধরনের ব্যবসা। বরং আরো বড় ব্যবসা। সেই ব্যবসা নিয়েও আমাদের মাঝে কিছু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ব্যবসা শব্দটি কানে আসার সাথে সাথেই আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে 'টাকা'। হ্যাঁ, টাকা হ'ল দুনিয়াবী জীবনের মুদ্রা। আর আমাদের মাথায় সর্বদা দুনিয়া ঘুরপাক খাওয়ার কারণে টাকাই কল্পনায় আসে। অন্যদিকে ছওয়াবও এক ধরনের মুদ্রা। এটা আখেরাতে চলবে। দুনিয়াতে ছওয়াব চলবে না, আবার আখেরাতে টাকা চলবে না। তবে টাকাকে ছওয়াবে বা ছওয়াবকে টাকায় পাল্টানো যায়। যেমন, আমি একজন অসহায়কে কিছু টাকা দিলাম। বিনিময়ে আমি সমপরিমাণ ছওয়াব পেলাম। আবার যে ইবাদত ছওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আমি শুধু টাকার উদ্দেশ্যেই করলাম। বিনিময়ে অল্প কিছু টাকা পেলাম।

ছওয়াবের বিনিময়ে টাকা সর্বদা অল্পই পাওয়া যায়। কারণ দুনিয়ায় ছওয়াবকে সবাই মূল্যহীন ভাবে। আবার আখেরাতে টাকা আরো বেশী মূল্যহীন হবে। দুনিয়ায় তো ছওয়াবের বিনিময়ে কিছু টাকা পাওয়া যায়, তবে আখেরাতে হাযার কোটি টাকার বিনিময়ে একটি ছওয়াবও পাওয়া যাবে না। তাহ'লে আমরা দুই ধরনের মুদ্রা পেলাম। একটা দুনিয়াবী, অপরটি উখরাভী বা পরকালীন। আর এই দুই ধরনের মুদ্রা উপার্জন করার একটিই স্থান। তা হ'ল দুনিয়া। আখেরাত কেবল ফল ভোগের জায়গা। সেখানে কোন উপার্জন চলবে না।

মুনাফার ধরন : এবার আমরা জানব, কোন মুদ্রায় কিভাবে মুনাফা আসে। টাকার হিসাব সর্বদা সীমিত। কারণ টাকার হিসাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ হয়। আর ছওয়াবের হিসাবে শুধু গুণ হয়, বাকী তিনটা হয় না। দুনিয়ায় যদি আপনি দশ টাকার কাজ করেন তবে দশ টাকাই পাবেন। আবার দশ টাকা যদি দুই ভাগে ভাগ করেন, তবে সেটা কমে পাঁচ টাকা হয়ে

যাবে। তবে ছওয়াবের হিসাব এমন নয়। আপনি যদি একটি ছওয়াবের কাজ করেন তবে বিনিময়ে আপনি দশ থেকে সাতশত ছওয়াব পেতে পারেন। আপনি যদি এককেজি গম টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেন তবে আপনি এককেজির দামই পাবেন। তবে যদি আপনি ছওয়াবের বিনিময়ে বিক্রি করেন তবে আপনি প্রতিটি গমের দানার বিনিময়ে একেকটি গাছ পাবেন। প্রতিটি গাছে থাকবে সাতটি করে শীষ। প্রতিটি শীষে একশটি দানা। ক্ষেত্র বিশেষে এর চেয়েও বেশী পেতে পারেন।

এরপরে মনে করুন, তিনশো টাকা পারিশ্রমিকের একটি কাজ আমরা তিনজন মিলে করেছি। টাকার হিসাবে আমরা প্রত্যেকে একশ' টাকা হারে পাব। যদি ছয়জন মিলে করি তবে সেটা কমে পঞ্চাশে নেমে আসবে। পক্ষান্তরে ছওয়াবের হিসাব ভিন্ন। জানাযার ছালাতে এক ওহোদ পাহাড় সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। এখন আপনি একটি জানাযায় যাওয়ার সময় আরো তিনজনকে ডেকে নিয়ে গেলেন। এখন কি এক ওহোদ পাহাড় চারভাগে ভাগ হবে? না! সকলের জন্যই আলাদা আলাদা ওহোদ পাহাড় সমান ছওয়াব রয়েছে। আর আপনি জানাযা ছালাতের জন্য ডেকেছেন, এজন্য আপনার অতিরিক্ত আরো তিন ওহোদ পাহাড় সমান ছওয়াব! টোটাল চার ওহোদ পাহাড়!

এখন আপনি যে তিনজনকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই আবার পথিমধ্যে আরো তিনজন করে ডেকে নিল। এখন আপনি যাদের ডেকেছিলেন তাদের হ'ল চার ওহোদ পাহাড় ছওয়াব। আর আপনার? আপনার হ'ল মোট ১৩ ওহোদ পাহাড় সমান ছওয়াব। কোনরকম কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই! তাহ'লে আমরা বুঝতে পারলাম, টাকা ভাগ করলে কমে যায়, পক্ষান্তরে ছওয়াব ভাগ করলে বাড়ে। এক হাযার টাকা দুই ভাগ করলে পাঁচশো হয়। আর এক হাযার ছওয়াব দুইভাগ করলে দুই হাযার হয়। আশা করি, দুই ধরনের মুদ্রার হিসাব বুঝতে কারো বাকী নেই। এবার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় যাব। অর্থাৎ শিক্ষা বাণিজ্য শিখব।

আসুন ব্যবসা শিখি : এডুকেশন বিজনেস করতে চাইলে শুরুতেই এর ইনভেস্ট সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ এই ব্যবসায় অনেক দীর্ঘ ইনভেস্টের প্রয়োজন হয়। শুরুতেই বিনিয়োগ করতে হবে শৈশবের হেসে-খেলে বেড়ানো দিনগুলো। বিনিয়োগ করতে হবে শেষ রাতের ঘুমগুলো। অনেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা লাগতে পারে পিতা মাতার আদর-যত্ন। বিনিয়োগ করা লাগতে পারে ইচ্ছামত তরকারী দিয়ে ভাত খাওয়ার স্বাধীনতা। মোটকথা, অনেক আবদার-চাওয়া-পাওয়া বিনিয়োগ করে একমাত্র হারানো-কেই আপন করে নেয়া লাগতে পারে।

এই দীর্ঘ বিনিয়োগের পরে আমার কাছে যে পণ্য জমা হবে তা হ'ল 'ইলম'। এটাই হ'ল আমার মূলধন। এখন আমাকে জানতে হবে, আমার অর্জিত অনেক ইলমের মধ্যে কোন ইলমটি বিক্রি করতে হবে এবং কার কাছে করতে হবে। তবেই আমি এই ব্যবসাতে কোটিপতি হ'তে পারব। অন্যথা বিনিয়োগ অনুযায়ী মুনাফা আসবে না। মনে করুন, আমি যদি একটি কারখানা তৈরী করি, তবে সেখানে কোন জিনিস তৈরী করতে বেশী আগ্রহী হব? যেটা মানুষের প্রতিবেলা কাজে লাগে সেটা, নাকি যা মাসে দু'বার প্রয়োজন হয় সেটা? আমি অবশ্যই প্রতিবেলা প্রয়োজন এমন জিনিসেরই কারখানা দেব। কারণ এখানে বিক্রি বেশী, লাভও বেশী।

ঠিক তেমনই ইলমের মধ্যে ঐ ইলমের কেনাবেচা বেশী করতে হবে, যা মানুষের প্রতিবেলা কাজে লাগে। আর মানুষের সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে কুরআন তিলাওয়াত। একজন মুসলমান না চাইলেও তাকে দিনে কমপক্ষে পাঁচবার কুরআন পড়তেই হয়। এজন্যই তো হাদীছে এসেছে, ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়। এবার বুঝতে পেরেছেন তো, ব্যবসা কোথায় বেশী? শুধু শাইখুল হাদীছ সেজে সপ্তাহে তিনটা লেকচারের মাঝে কোন মহত্ব নেই। ছওয়াবের ব্যবসায় যদি কোটিপতি হ'তে চান, তবে মক্তবে আসুন। ইলমের ব্যবসা এখানেই জমজমাট।

দুঃখের বিষয় হ'ল, আমাদের শিক্ষকগণ এমনই এডুকেশন বিজনেস করেন যে, তারা শিক্ষার্থীদের সূরা ফাতিহার শিক্ষক হ'তে চান না। ছালাত শেখাতে চান না। তারা এমন কিছু শেখাতে আগ্রহী যা শিক্ষার্থীদের খুব কমই আমলে আসবে। এর অবশ্য কারণও রয়েছে। আমরা শিক্ষকতার মর্যাদাকে তার পদের সাথে বেঁধে দিয়েছি। তিনি কোন কিতাব পড়ান? তিনি কোন পদে আছেন? সে অনুযায়ী তার বেতন, তার সম্মান, তার গ্রহণযোগ্যতা। এজন্য একটু বেশী বেতনের আশায় আমাদের 'ওপরের পদ' খুঁজতে হয়। আগ্রহ না থাকলেও বিভিন্ন কাজ করতে হয়। কারণ এগুলো প্যাকেজ আকারে তৈরী করা হয়েছে। যে পদ নিবেন, সেখানকার দায়িত্ব, বেতন, সম্মান সবই নিতে পারবেন।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, শিক্ষকতার মাঝে আবার হরেক পদ থাকবে কেন? শিক্ষকতার একটিই পদ হবে। শুধুমাত্র 'শিক্ষক'। বেতন-ভাতা নাহয় তাদের পরিশ্রম-দায়িত্ব ইত্যাদির ওপরে কম-বেশী হ'ল। যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্বগুলো বণ্টিত হ'ল। আমার তো খুব মন চায়, আমি শিক্ষার্থীদের সূরা ফাতিহার শিক্ষক হব। তারা আমার কাছে ছালাত শিখবে। তারা আমার কাছে মাসনূন দো'আ শিখবে। তারা আমার কাছে শিখবে, কিভাবে সুন্নাতী পদ্ধতিতে খেতে হয়, ঘুমাতে হয়। আর এগুলোর ওপর তারা নিজেরা সারাজীবন আমল করবে আবার পরিবার-পরিজনকে শিখাবে। আর এই সকল ছওয়াব আমি পাব।

আমার এক শিক্ষক ছিলেন। হিফয বিভাগে। তার কাছে যত ছাত্র হিফয শেষ করেছে তাদের সবার নাম ঠিকানা তিনি একটি সুন্দর ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। আমি যেদিন তার কাছে সবক শেষ করেছিলাম সেদিন তিনি তার ডায়েরীতে আমার নামও লিখলেন। আমি বললাম, উস্তাদজী! এভাবে নাম লিখে রাখার কারণ কি? তিনি বললেন, এগুলো হ'ল আমার সঞ্চয়। মানুষ নিজের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট লিখে রাখে না? এগুলো হ'ল আমার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট। তখন আমি এতকিছু বুঝতাম না। তবে এখন ঐ ব্যবসা আমি বুঝি। এখন আমারও মনে হয়, আমার অনেক অনেক এ্যাকাউন্ট দরকার।

এডুকেশন বিজনেস মূলত ছওয়াবের বিজনেস। এই ব্যবসা এভাবেই হয়। আমি আপনাকে ক্যালকুলেটর ভাঙ্গা হিসাব দেখাতে চেয়েছিলাম। সেটা এখন দেখাব। মনে করুন, আমি জীবনে ১০০০ ছাত্র তৈরী করেছি। তাদের আকাঈদ ও ইবাদাত শিখিয়েছি। সুতরাং এই এক হাযার জন যা ইবাদত করেছে তার সবগুলো আমার। তন্মধ্যে ৪০০ ছাত্র আবার ইলমের খিদমতে

যুক্ত হয়েছে। তারা প্রত্যেকে সারা জীবনে কেউ ৩০০ কেউ ৪০০ ছাত্র তৈরী করেছে। সেগুলোও আমার। তাদের প্রত্যেকের যে তিন-চারশো করে ছাত্র তৈরী হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা অংশ আবার ইলমের খিদমতে যুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই আরো দুই-তিনশো করে ছাত্র তৈরী করেছে। সেগুলোও আমার।

এই ধারাবাহিকতা চলবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। এরা সবাই আমার একেকটি সঞ্চয়। আমার একটি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট। এবার আপনি আমার ছওয়াব নয় বরং এ্যাকাউন্টের সংখ্যা হিসাব করুন। একজন মুসলিম শুধু পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে ১৭ বার। আল্লাহ প্রতি হরফে দশটি ছওয়াব দিবেন, আপনি সেই ছওয়াবের হিসাব নয় বরং আমার ফাতিহা তিলাওয়াতের সংখ্যা হিসাব করুন। ক্যালকুলেটর কি ভাংবে না? এবার আপনিই বলুন, এই লোভনীয় হিছছা ছাড়া যায়? শিক্ষক তো হয়েছিই এজন্য।

আমরা শিক্ষার্থীদের শাসন করার জন্য কতজন আমাদের ওপর মন খারাপ করেন। আমরা সেগুলো মেনে নিই। আমরা চাই, আমাদের প্রোডাক্টগুলো কোয়ালিটিফুল হোক। বর্তমান যুগে কর্মীর তুলনায় কর্মক্ষেত্র কম। সুতরাং আমি যদি চাই, আমার প্রতিটি প্রোডাক্ট মার্কেটে স্থান পাক, তবে আমাকে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট তৈরী করতে হবে। এছাড়া ব্যবসায় লস হবে। বিশ্বাস করুন, একমাত্র এই উদ্দেশ্য ছাড়া আমরা কখনোই কোন শিক্ষার্থীদের জোর করে পড়াতাম না। শাসন করতাম না। শাসন করি, বকা দেই তার উদ্দেশ্যই হ'ল, তাকে তুলনামূলক যোগ্য করে গড়ে তোলা। কারণ এটা আমার শিক্ষা-বাণিজ্যের অংশ।

শেষ কথা : আমি দুনিয়ায় অনেক সফল মানুষ দেখেছি। যাদেরকে আল্লাহ মুসলিম করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের তাওফীক দিচ্ছেন। পয়সা-কড়িও দিয়েছেন। এতটুকুর মাঝেই তারা নিজেদের সফলতা খুঁজে নিয়েছে। তবে তাদের শুধু একটি বিষয়ে আমার আফসোস হয় যে, তারা জীবনে যা গুনাহের কাজ করেছে এই সমস্ত গুনাহের পাল্লাকে মোকাবিলা করার জন্য শুধু তাদের নিজেদের ছওয়াব রয়েছে। এত এত গুনাহ শুধু একটি আমলনামার ছওয়াব দিয়ে কিভাবে ওপরে উঠবে! আমার শুধু এই ভয় কাজ করে। যদি এক আমলনামা গুনাহের বিপরীতে দশটি ছওয়াবে পূর্ণ আমলনামা থাকত, তবে কিছুটা ভরসা পাওয়া যেত। শুধু একটি আমলনামা নিয়ে মীযানের পাল্লায় পার হওয়া সত্যিই খুব মুশকিল হয়ে পড়বে।

আমার মনে হয়, দুনিয়ার বুকে যাদের শিক্ষা-বাণিজ্য করার সুযোগ হচ্ছে না, তাদের অন্তত আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবসার শেয়ার হোল্ডার হওয়া প্রয়োজন। যে প্রতিষ্ঠান অর্থের অভাবে চলতে পারছে না সেখানে আর্থিক সহযোগিতা করলে সেখানে যত ইলমের খিদমত হবে তার সমান অংশ সহযোগিতাকারী ব্যক্তি পাবেন। আমার এক শিক্ষক বলতেন, 'যদি তুমি কোন কিছুর দখল চাও তবে নিজের মালিকানাধীন জিনিস তার মধ্যে প্রবেশ করাও। সুতরাং শুধু প্রয়োজন হ'লেই শেয়ার হোল্ডার হওয়া যাবে এমনও নয়।

কোন দারুল হাদীছে গিয়ে বলতে পারেন, এই বছরে শিক্ষার্থীদের যাবতীয় হাদীছের কিতাব আমি কিনে দেব। আরেক মক্তবে গিয়ে বলতে পারেন, এখানে কুরআন শিখানো হয়, এখানে আমি একটি বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে দেব। শিক্ষার্থীদের কুরআন পড়তে গিয়ে যদি পিপাসা পায় তবে তারা যেন সেখান থেকে পানি পান করেত পারে। চাইলে এভাবেও শিক্ষা বাণিজ্যে শেয়ার নেয়া যায়। আমার এক বন্ধু ছিল, তার পিতার ১৬টি ব্যাংক একাউন্ট। এর মাঝে শুধু একটিতে টাকা জমাও হয় আবার খরচও হয়। বাকীগুলো থেকে কোন খরচ হয় না। শুধু জমা হয়। জমি কেনা ব্যতীত তিনি বাকী পনেরটি একাউন্টে হাত দিতেন না। তিনি হয়ত অর্থনীতি বেশ ভাল বোঝেন। এজন্যই এমনটা করেছেন। তবে একজন মুসলিমের অর্থনীতি বোঝার আগে ছওয়াবনীতি বুঝতে হবে।

এজন্য আমি বুলি, আমি একজন গর্বিত শিক্ষা-ব্যবসায়ী। শিক্ষা-বাণিজ্য আমার শিরা-উপশিরায় বহমান। আমি হাশরের ময়দানে লক্ষাধিক আমলনামা নিয়ে উপস্থিত হব ইনশাআল্লাহ। যার একটিতে থাকবে ছওয়াব ও গুনাহের মিশ্রণ। বাকীগুলোতে থাকবে শুধু ছওয়াব আর ছওয়াব। সেই ছওয়াব দিয়ে আমি কিনে ফেলব এমন একশটি দুনিয়া। সেদিন আমার শাহী বালাখানার বিশাল সিংহাসনে বসে পায়ের ওপর পা তুলে বলব, যে ব্যক্তি দুনিয়া চায়, সে যেন ইলম অর্জন করে। যে আখেরাত চায়, সেও যেন ইলম অর্জন করে। আর যে উভয়ই চায়, সেও যেন ইলম অর্জন করে।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারুণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর দৃঢ়তা

-ড. নূরুল ইসলাম

ন্যায়বিচার একটি শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণমুখী সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার শুধু একটি নৈতিক গুণ নয়; বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত অপরিহার্য বিধান এবং ইসলামী সভ্যতার আদর্শিক ভিত্তি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মানুষকে সর্বাবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকার শিক্ষা দিয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগত স্বার্থ, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতাও যেন ন্যায়বিচারের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সে নির্দেশও ইসলাম দিয়েছে *(মায়েদাহ ৫/৮)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন...' *(নাহল ১৬/৯০)*। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। আর তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহলে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে...' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা ন্যায়বিচার করে, তারা আল্লাহ্র নিকট নূরের মিম্বরসমূহের ওপর অবস্থান করবে, যা পরম করুণাময়ের ডান পাশে থাকবে। আর তাঁর উভয় হাতই ডান হাত। তারা হল ঐসকল ব্যক্তি, যারা নিজেদের বিচার-ফয়ছালায়, নিজেদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যাদের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে– সেসব বিষয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে'।[১] তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'।[২]

খোলাফায়ে রাশেদীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের শাসনামলে ন্যায়বিচারের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর আমলের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা নিম্নরূপ-

গাসসানী রাজার উপর ক্বিছাছ কায়েম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওমর (রাঃ) :

উজাবালাহ ইবনুল আইহাম ছিলেন শাম অঞ্চলের খ্রিস্টান আরব গোত্র গাসসান-এর সর্বশেষ রাজা। তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর খেলাফতকালে রোমানদের পক্ষে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। পরে ওমর (রাঃ)-এর যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, জাবালাহ ইবনুল আইহামের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ ওমর (রাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। এরপর তিনি তাঁকে মদীনায় আসার আমন্ত্রণ জানান। অন্য বর্ণনায় আছে, জাবালাহ নিজেই মদীনায় আসার অনুমতি চাইলে ওমর (রাঃ) তাঁকে অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি তাঁর কওমের বহু লোককে সাথে নিয়ে- কেউ বলেন দেড়শ, কেউ বলেন পাঁচশ অশ্বারোহীসহ-মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ওমর (রাঃ) তাঁর অভ্যর্থনার জন্য উপঢৌকন ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মদীনায় প্রবেশের দিনটি ছিল এক স্মরণীয় দিন। তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারে সজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে এবং মণিমুক্তাখচিত মুকুট পরে নগরে প্রবেশ করেন। মদীনার নারী-পুরুষ তাঁকে এক নজর দেখার জন্য বেরিয়ে আসে। তিনি ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ওমর (রাঃ) তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজের নিকটে বসান।

সে বছর তিনি ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জ পালন করেন। তাওয়াফের সময় বনু ফাযারাহ গোত্রের এক ব্যক্তি অসাবধানতাবশত তাঁর লুঙ্গির এক প্রান্তে পা দিলে তা খুলে যায়। এতে জাবালাহ ক্রুদ্ধ হয়ে লোকটির নাকে এমন সজোরে আঘাত করেন যে, তার নাক ভেঙে যায়। তখন লোকটি বনু ফাযারাহ্র বহু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ওমর (রাঃ)-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করে। ওমর (রাঃ) জাবালাহকে ডেকে পাঠালে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার ওপর কিসাস কার্যকর হবে'। জাবালাহ বললেন, 'কীভাবে? আমি তো একজন রাজা, আর সে একজন সাধারণ মানুষ!' তখন ওমর (রাঃ) বললেন, إنَّ الإسلام جمعك وإياه فلستَ تفضلُه إلَّا بالتقوى 'ইসলাম তোমাকে ও তাকে একই মর্যাদায় এনে দাঁড় করিয়েছে। তাক্বওয়া ছাড়া তার ওপর তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই'। জাবালাহ বললেন, 'আমি তো মনে করেছিলাম, ইসলামে এসে জাহিলিয়াতের যুগের চেয়ে আরও বেশী সম্মানিত হব'। ওমর (রাঃ) বললেন, 'এসব কথা বাদ দাও। তুমি যদি ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট না কর, তবে তোমার ওপর ক্বিছাছ কার্যকর করা হবে'। জাবালাহ বললেন, 'তাহলে আমি খ্রিস্টান হয়ে যাব'। ওমর (রাঃ) বললেন, 'তুমি যদি ইসলাম ত্যাগ করো, তবে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব'। বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুতর, তা বুঝতে পেরে জাবালাহ বললেন, 'আমাকে আজ রাত পর্যন্ত চিন্তা করার অবকাশ দিন'। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে যান। রাত গভীর হলে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সংগোপনে শামের দিকে পালিয়ে যান। পরে রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে কনস্টান্টিনোপলে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত হন। হিরাক্লিয়াস তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন, সম্মানিত করেন, বহু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন, প্রচুর ভাতা নির্ধারণ করে দেন, মূল্যবান উপহার দেন এবং নিজের ঘনিষ্ঠ সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দীর্ঘকাল সেখানেই অবস্থান করেন।

পরবর্তীকালে ওমর (রাঃ) হিরাক্লিয়াসের কাছে একটি পত্র পাঠান। পত্রবাহক দূতকে হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি তোমার চাচাতো ভাই জাবালাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করেছ?' তিনি বললেন, 'না'। তখন হিরাক্লিয়াস তাঁকে জাবালাহ্র সঙ্গে দেখা করতে বলেন। দূত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেখলেন, তিনি দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন-বিলাসবহুল পোশাক, বিছানা, সুগন্ধি, দাসী, উন্নত আহার, পানীয় ও রাজকীয় প্রাসাদে পরিবেষ্টিত। দূত তাঁকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে শামে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। জাবালাহ্ বললেন, 'আমার মতো ব্যক্তি, যে ইসলাম ত্যাগ করেছে, তার কি আবার ফিরে আসার সুযোগ আছে?' দূত বললেন, 'অবশ্যই। আশ'আছ ইবনু কায়েসও একসময় মুরতাদ হয়েছিল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। পরে সে তওবা করে ফিরে এলে মুসলিমরা তাকে গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাঁর বোন উম্মু ফারওয়ার সঙ্গে তার বিয়েও দিয়েছিলেন।[৩]

উক্ত ঘটনা থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর দৃঢ়তা প্রতীয়মান হয়। সেই সাথে বিচারের ক্ষেত্রে উঁচু-নীচু কোন ভেদাভেদ নেই- ইসলামের এই সার্বজনীন নীতি প্রতিফলিত হয়েছে।

১. *মুসলিম হা/১৮২৭।*
২. *বুখারী হা/৪৩০৪।*
৩. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, (বৈরূত: দারু ইবনি কাছীর, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), ৮/৮৯-৯০; মাকরীযী, ইমতাউল আসমা' ১৪/২৪৫-৪৭।*

কবিতা

ক্ষণিকের মুসাফির

-মিছবাহুল হক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

এই যে রঙের সরাইখানা, ক্ষণিকের এক মেলা,
মিথ্যে মায়ার বাঁধনে পড়ে, করিস না দিন-হেলা।
আজ যেথা বাজে নহবৎ সুর, আলো ঝলমল হাসে,
কাল সেথা গোর-আঁধারের ঘুম, নীরব মৃত্যু আসে।
কোথায় সে আজ শাহানশাহেরা, কোথায় জাঁহাপনা?
মাটির কবরে ধুলিস্যাৎ আজ, স্বর্ণ-রত্ন-কণা।
বাদশাহ আর পথের ফকীর, সমান কাফন গায়,
খালি হাতে সব চলে যায়, এক আল্লাহ্র ইশারায়।
দু'দিনের এই পান্থশালায় মিছে এই কোলাহল,
আখেরাতের সম্বল বিনা সবই তো নিষ্ফল।
সাদা কাপড়ের তিন টুকরোতে শেষ হবে সব চাওয়া,
মাটির শয্যা হবে শেষ ঘর শেষ হবে আসা-যাওয়া।
দুনিয়াটা হ'ল কৃষিক্ষেত্র আখেরাতেরই ভাই,
আজ যা বুনবি কাল তা কাটবি এর বিকল্প নাই।
মরীচিকা এই নশ্বর ধরা চিরস্থায়ী কিছু নয়,
পরকালের অবিনশ্বর জীবন হোক প্রশান্তিময়।

ইনশিরাহ-এর ভাবানুবাদ

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

প্রভু! তুমি করেছ নবীর বক্ষ প্রসারণ,
করেছ তার দুর্বিষহ বোঝা অপসারণ।
যা ভেঙে দিচ্ছিল তার দ্যুতিময় পৃষ্ঠদেশ,
সমুন্নত করেছ তার খ্যাতির পরিবেশ।
অবশ্যই কষ্টের সাথে থাকে যে নিষ্কৃতি,
নিশ্চয়ই অশান্তির পর আসে প্রশান্তি।
যখনই অবসর পাই করি ইবাদত,
বিনয়ের সাথে রবের পানে করি রাজা'আত।

একটি সফরের বিদায়

-মুবাশশির সা'দ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মনে করো সেদিন, যবে সবক খুলে
কুরআন পাঠে দিয়েছিলে শ্রম সবভুলে।
মনে করো আজ ঐসব দিনগুলি
হয়েছে গত, এসেছ ফেলে পদধূলি।
আজ তুমি পরিণত হিফযের পাঠে
শুকরিয়ার সিজদা কর ললাটে।
তোমরা তো সেই দল যাদের হাশরে
দেখা যাবে জান্নাতের ঊর্ধ্ব ধাপান্তরে।
আহলান সাহলান ওহে হুফফায
পিতৃ-মাতৃমস্তকে পরাবে নূরতাজ।
যদি ইয়াদে-আমলে করো গাফেলতি
তবে দু'কালেই খারাপ হবে পরিণতি।
কুরআন তোমার অন্তরে আমানত
রূহের সংবিধান মেনে নাও শপথ।

এসো কলম ধরি

-মুহাম্মাদ আলী আকবর,
বদরগঞ্জ, রংপুর।

এসো আজ হাতে তুলি কলম চেতনার হাতিয়ার,
কালির আখরে ঘুচিয়ে দেবো জরা ও অন্ধকার।
তরবারি নয় শাণিত কলম আনবে নতুন দিন,
অক্ষরগুলো বারুদ ছড়াবে শোধবে যুগের ঋণ।
যেই যমীনে যুলুমের রাজ শিকল জড়েছে পায়,
মোদের কলম-কালিতে যেন যালিম নিপাত যায়।
কাগজের বুকে বিদ্রোহ আজ গর্জে উঠুক ভাই,
জাগ্রত এই লেখনির কাছে যালিমের দিশা নাই।
শব্দেরা আজ বল্লম হয়ে হানুক রে খঞ্জর,
কলমের ঘায় বিদীর্ণ হোক পাষাণের অন্তর।
এসো ভাই আজ কলম ধরি ভাঙি সব শৃঙ্খল,
আমাদের এই অক্ষরতাপে কাঁপিবে এ ভূতল।
অলস মগজে আগুন জ্বালাও জাগাও সুপ্ত প্রাণ,
কলমের মুখে ধ্বনিত হোক সাম্যের জয়গান।
সত্যের পথে লেখনী তোমার হোক সদা দুর্বার,
এসো কলম ধরি, খুলে দিই আজ আলোর রুদ্ধ দ্বার।

Khalisun Products
খলিসুন প্রোডাক্টস
বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত

- বিশুদ্ধ মরিচ গুড়া-৫২০ Tk/Kg
- হলুদ গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ধনিয়া গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ভাজা ধনিয়া গুড়া-৫০০ Tk/Kg
- ভাজা জিরা গুড়া-১৫০০ Tk/Kg

- হোম মেড
- পরিষ্কার ও বাছাই করা মরিচ
- হলুদ ধুয়ে শুকিয়ে তৈরি করা
- রং ও কেমিক্যাল মুক্ত
- দেশী মরিচ, হলুদ ও ধনিয়া
- ১০০% খাঁটি ও অথেন্টিক
- ধনিয়া/জিরা ধুয়ে শুকিয়ে ভেজে গুড়া করা
- গরম মসলা গুড়া
- শাহী গরম মসলা গুড়া

বি: দ্র: অর্ডার মোতাবেক তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।
SCAN ME
বিসিক নিবন্ধন নং : RA–20251109–0022719
যোগাযোগ : (ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৩৩৯-৯৮৬৮৪৮ Khalisun Products

দারুল আবরার লাইব্রেরী
এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাফসীর পাবলিকেশন'-এর তাফসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

স্বদেশ

ডাক বিভাগের নতুন সেবা : মাত্র ১০ টাকায় সারা দেশে ডেলিভারি

দেশের সাধারণ মানুষ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং ই-কমার্স ব্যবসায়ীদের দ্রুত ও নিরাপদ কুরিয়ার-সুবিধা দিতে ডাক বিভাগ চালু করেছে তাদের বিশেষায়িত পার্সেল পরিবহন সেবা 'স্পিড পোস্ট'। 'আজ বুকিং, আগামীকাল ঢাকা, ৪৮ ঘণ্টায় সারা বাংলাদেশ'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে চালু হওয়া সরকারী প্রতিষ্ঠানটি এখন দেশের দ্রুততম ও সবচেয়ে সাশ্রয়ী কুরিয়ার সেবার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এর আওতায় ঢাকায় ২৪ ঘণ্টা এবং ঢাকার বাইরে সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছে যাবে। 'স্পিড পোস্ট' সেবার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হ'ল এর অবিশ্বাস্য ডাক মাশুল। দেশের যেকোন প্রান্তে প্রথম ১ কেজি পণ্য পাঠাতে মাশুল নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ১০ টাকা। এরপর পরবর্তী প্রতি কেজির জন্য খরচ লাগবে মাত্র ৫ টাকা। গ্রাহকদের সুবিধার্থে ডিজিটাল ডাক মাশুল ক্যালকুলেটর এবং অনলাইনে পার্সেলের সর্বশেষ অবস্থান জানার জন্য ২৪ ঘণ্টার ডিজিটাল ট্র্যাকিং সুবিধাও এতে যুক্ত করা হয়েছে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পার্সেল পাঠানোর জন্য রয়েছে বিশ্বস্ত ইএমএস বা বৈদেশিক পার্সেল সেবা। ডাক বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে এই সেবা দেওয়া হচ্ছে।

পাটকাঠি থেকে বিস্ময়কর গ্রাফিন তৈরি : বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর অভাবনীয় সাফল্য

বাংলাদেশী গবেষক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে একদল আন্তর্জাতিক গবেষক সাধারণ কৃষিজ বর্জ্য পাটকাঠি থেকে উচ্চমূল্যের 'গ্রাফিন' তৈরির এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। সঊদী আরবের কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অব পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেলসে সম্পন্ন হওয়া এই গবেষণায় দেখা গেছে, সহজ তাপপ্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে পাটকাঠি থেকে প্রায় ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ কার্বনযুক্ত ও অত্যন্ত স্থিতিশীল ত্রিমাত্রিক গ্রাফিন কাঠামো তৈরি করা সম্ভব। গ্রাফিন হ'ল কার্বনের এমন একটি রূপ যা স্টিলের চেয়েও ২০০ গুণ বেশী শক্তিশালী কিন্তু কাগজের চেয়েও পাতলা। এর অসাধারণ বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ও নমনীয়তার কারণে এটি অতি দ্রুত চার্জ হওয়া ব্যাটারি, স্মার্টফোনের ফ্লেক্সিবল স্ক্রিন, উন্নত সেন্সর এবং পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তিতে 'বিস্ময়কর উপাদান' হিসাবে বিবেচিত। স্বল্পমূল্যের কৃষিজ বর্জ্যকে উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক উপকরণে রূপান্তরের এই 'বায়োমাস ভ্যালোরাইজেশন' প্রক্রিয়াটি ভবিষ্যতে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলে বাংলাদেশের মতো পাট উৎপাদনকারী দেশগুলোর জন্য নতুন অর্থনৈতিক মাইলফলক তৈরি করবে।

[আমরা গবেষককে ধন্যবাদ জানাই এবং সরকারের কাছে দাবী জানাই তাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের জন্য (স.স.)]

বিদেশ

ফিলিস্তীনী বন্দীদের পলায়ন রোধে কুমিরবেষ্টিত কারাগার বানাচ্ছে ইস্রাঈল

ফিলিস্তীনী বন্দীদের পলায়ন রোধে কুমিরবেষ্টিত জলপথ সংবলিত একটি উচ্চ নিরাপত্তার কারাগারে রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন ইস্রাঈলের চরমপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির। প্রায় ছয় মাস আগে উত্থাপিত এই অমানবিক প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে এরই মধ্যে আইনী প্রক্রিয়াও শুরু করেছে ইস্রাঈল। দেশটির পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, কারাগারের চারপাশে কুমিরভর্তি পরিখা থাকলে নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি ব্যয়ও কমবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ইস্রাঈলের বিভিন্ন কারাগারে নারী, শিশু ও বয়স্কসহ প্রায় ৯ হাযার ৫০০ ফিলিস্তীনী বন্দী মানবেতর জীবন যাপন করছেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, এসব বন্দীকে অনাহারে রাখা, নির্মম নির্যাতন এবং চিকিৎসাবঞ্চিত করার কারণে এরই মধ্যে অনেক বন্দীর মৃত্যু হয়েছে। এর মাঝেই নতুন করে কুমিরবেষ্টিত কারাগার নির্মাণের এই পাশবিক উদ্যোগ সামনে এলো।

[আমরা এই উদ্যোগের তীব্র নিন্দা জানাই। সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই (স.স.)]

মুসলিম জাহান

ভারতের কেরালায় জ্যামিতিক হারে বাড়ছে ইসলাম

রাষ্ট্রীয় নানা প্রতিকূলতা ও হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর অপপ্রচার সত্ত্বেও ভারতের কেরালায় ইসলাম গ্রহণের হার জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেরালা সরকারের অফিসিয়াল গেজেটের তথ্যে দেখা যায়, অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম গ্রহণের হার বহুগুণ বেশী এবং হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে চলে যাওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেরালায় ১৪৪ জন নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর ২০২৪ সালের সাম্প্রতিক ডেটায় দেখা যায় রেকর্ডসংখ্যক ৩৪৩ জন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই নওমুসলিমদের বড় অংশই এসেছেন হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে। অন্যদিকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণের চেয়ে তা ত্যাগের হার ব্যাপকভাবে বাড়ছে। ২০২৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৩৬৫ জন হিন্দু ধর্মে এলেও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে গেছেন ৫১০ জন মানুষ। এর মধ্যে সরাসরি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের হার চার বছরের ব্যবধানে দ্বিগুণেরও বেশী (১১১ জন থেকে ২৭৬ জন) বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, শত প্রতিকূলতার মাঝেও কেরালায় ইসলামের প্রসার নাটকীয় গতিতে অব্যাহত রয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সঊদী বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন বিদ্যুৎবিহীন এসি 'নেসকোড'

বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা তাপপ্রবাহের মাঝে এসির এক দারুণ বিকল্প উদ্ভাবন করেছেন সঊদী আরবের 'কিং আব্দুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স'র বিজ্ঞানীরা। বিদ্যুৎ ছাড়াই চলা নতুন এই কুলিং সিস্টেমটির নাম দেওয়া হয়েছে 'নেসকোড'। এটি মূলত একটি দ্বিমুখী চক্র মেনে কাজ করে। প্রথম ধাপে পানির সাথে সস্তা ও সহজলভ্য অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট লবণ মেশানো হয়। এই মিশ্রণ দ্রুত চারপাশের তাপ শোষণ করে নেয়। ফলে তাপমাত্রা কমে ৫-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে, যা ঘর ঠান্ডা রাখা ও খাবার সংরক্ষণের জন্য আদর্শ। সিস্টেমটি বারবার ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানীরা একটি থ্রি-ডি সোলার রিজেনারেটর তৈরি করেছেন। এটি সৌরশক্তি কাজে লাগিয়ে দ্রবণ থেকে পানি বাষ্পীভূত করে। ফলে লবণটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে এবং পরবর্তী ব্যবহারের জন্য সিস্টেমটি রিচার্জ হয়। এটি দিনে সৌরশক্তি জমা করে রাতেও শীতলীকরণের কাজ করতে পারে। সবচেয়ে মজার বিষয় হ'ল, এই প্রক্রিয়ায় তৈরি জলীয়বাষ্প থেকে বিশুদ্ধ পানিও সংগ্রহ করা যায়। অল্প জায়গায় কাজ করতে পারা থ্রি-ডি কাঠামোর কারণে এর উৎপাদন খরচও বেশ কম। বিশেষজ্ঞদের মতে উন্নয়নশীল দেশ এবং দুর্গম অঞ্চল যেখানে প্রথাগত বিদ্যুৎ অবকাঠামো পৌঁছানো ব্যয়বহুল, সেখানে এই প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী বিকল্প হিসাবে বড় ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৬

সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান মেনে চলুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

জোনাকি কনভেনশন হল, ঢাকা ১১ই জুলাই শনিবার : 'জাহেলিয়াত বর্জন করি, অহি-র আলোয় সমাজ গড়ি' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ১১ই জুলাই শনিবার ঢাকার নয়াপল্টনস্থ জোনাকি কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত হ'ল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৬। সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রাণবন্ত এই সম্মেলনে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য : সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি সূরা আন'আমের ৫০ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সার্বিক জীবন অহি-র আলোকে পরিচালিত ছিল। তাঁর নিকটে কোন ধনভাণ্ডার ছিল না। তিনি গায়েব জানতেন না। তিনি ফেরেশতা বা নূরের নবী ছিলেন না। বরং তিনি মানুষ নবী ছিলেন এবং বিশ্বমানবতার জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন। অতএব আমাদেরকে সার্বিক জীবনে তাঁরই অনুসারী হ'তে হবে। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের আক্বীদা হবে মযবূত ও আচরণ হবে নরম। এর মাধ্যমেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াতী কার্যক্রম জোরালোভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

সভাপতির ভাষণ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ : সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, বর্তমান যুবসমাজ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জাহেলিয়াতের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই পথভ্রষ্ট যুবসমাজকে অহি-র আলোয় আলোকিত করতে আমাদেরকে ব্যাপক দাওয়াত এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তথা জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে যুবসমাজকে নিরলস ভূমিকা পালন করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার প্রিন্সিপাল হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), 'যুবসংঘে'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীন ও ড. মীযানুর রহমান, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত বিন হান্নান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম এবং 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ।

এতদ্ব্যতীত 'যুবসংঘে'র বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, কুমিল্লা যেলা সভাপতি রূহুল আমীন, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি আব্দুর রায্যাক, বরিশাল যেলা সাধারণ সম্পাদক মা'ছূম বিল্লাহ, রাজশাহী-পশ্চিম যেলা সভাপতি আবুল কাসেম, গাযীপুর-দক্ষিণ যেলা সভাপতি আলে ইমরান, বাগেরহাট যেলা সভাপতি ওবায়দুর রহমান, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি সাইফুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মুজাহিদুর রহমান, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আকরাম হোসাইন ও শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন।

অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ছাত্র ছাকিবুল হাসান ও হাফেয আহনাফ মুবাশ্শির। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), ইয়াকূব আলী ও তানভীরুয্যামান (মেহেরপুর), আবুবকর ছিদ্দীক ও রাতুল আসলাম (রাজশাহী) এবং দ্বীন ইসলাম (সাতক্ষীরা)। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম এবং তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন। এছাড়াও অন্যান্যগণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

সম্মেলনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ পেশ করা হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ প্রস্তাবনা পাঠ করেন ও উপস্থিত সকলে তা সমর্থন করেন।-

১. বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। অহি-র আলোকে রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় নীতিগত সহায়তার জন্য যোগ্য ও নিরপেক্ষ আলেমদের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করতে হবে।

২. আধুনিক জাহেলিয়াত ও আধিপত্যবাদী শক্তির যেকোন আগ্রাসন থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নের পাশাপাশি দেশের তরুণ সমাজকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩. মানব রচিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও বৈষম্যমূলক আইনের করাল গ্রাস থেকে বিচার বিভাগকে মুক্ত করতে হবে। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য 'শারঈ বিচারব্যবস্থা' চালু করতে হবে।

৪. শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বিজাতীয় মতবাদের জাহেলিয়াত দূর করে সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকে রাসূল (ছাঃ)-এর সীরাত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নৈতিক অবক্ষয় রোধে সহশিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ও নিরাপদ শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণের শিরকী প্রথা এবং ভিনদেশী অপসংস্কৃতির আগ্রাসণ রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। তরুণ সমাজকে ধ্বংসকারী আধুনিক জাহেলিয়াত তথা অনলাইন জুয়া,

পর্ণোগ্রাফি রুখতে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে।

৬. ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট, মজুতদারী, ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অবলম্বন করতে হবে। খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল প্রদানকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে সূদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে।

৭. ভিনদেশী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং পানি আগ্রাসনের মতো আধিপত্যবাদী আচরণ রুখে দিতে রাষ্ট্রকে আপসহীন হ'তে হবে। ফিলিস্তীন ও ভারতসহ বিশ্বজুড়ে নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

৮. ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থাকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। পাশাপাশি কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদসহ সকল বাতিল ফের্কা এবং সমাজে অনুপ্রবেশকারী শিরক-বিদ'আতের অন্ধকার দূর করতে রাষ্ট্রকে আপসহীন পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯. দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তাহীনতার ভয়াবহতা দূর করতে হবে। অর্থাৎ খুন, ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধের শাস্তি নিশ্চিতে রাষ্ট্রকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এই সম্মেলন থেকে আমরা চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যাদুর্গত মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাদের পুনর্বাসনে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

১০. যুবসমাজকে বেকারত্বের অভিশাপ ও হতাশাপূর্ণ জীবন থেকে রক্ষার্থে তাদেরকে বাস্তবমুখী শিক্ষা, কারিগরী ও আইটি খাতে দক্ষ করতে হবে এবং দেশেই তাদের হালাল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে।

সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্টসমূহ :

জুম'আর খুৎবা : এবারের কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলগণ ঢাকা শহরের ২০টি মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

কর্মী উপস্থিতি : দেশের সকল যেলা থেকে প্রায় এক হাযার আটশত কর্মী ও সুধী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, মূল অডিটোরিয়ামে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় অনেকেই বাইরে চেয়ারে বসে বক্তব্য শ্রবণ করেন।

স্টল সমূহ : সম্মেলনে বাইরের মূল গেইটের ডান পার্শ্বে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিং পরিচালনা করেন নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ যেলার দায়িত্বশীলবৃন্দ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২৩ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনার' তালিকাভুক্ত হন।

এছাড়াও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' বিক্রয় বিভাগের জন্য বুকস্টল ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সংগঠনের পরিচিতি বিষয়ক স্টল স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে সাংগঠনিক বই, পরিচিতি, যুবসংঘে'র মনোগ্রাম সম্বলিত গেঞ্জি, চাবির রিং, কলম ও প্যাড ইত্যাদি বিতরণ ও বিক্রয় করা হয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বানভাসী মানুষের পাশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'

২০২৬ সালের জুলাইয়ের বর্ষা মৌসুমে টানা বর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলের ফলে দেশের বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে মারাত্মক বন্যা ও ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটে। আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে লাখ লাখ মানুষ। পানির তোড়ে ভেসে যায় হাস-মুরগী, গবাদীপশু ও পুকুরের মাছ। তলিয়ে যায় ফসলের মাঠ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর** নির্দেশনায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহ প্রতিবারের ন্যায় এবারও সাধ্যমত বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলগণ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী এবং অন্যান্য সাহায্য অসহায় মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেন। বিস্তারিত নিম্নরূপ-

১৪ই জুলাই মঙ্গলবার বাঁশখালী, চট্টগ্রাম : অদ্য বিকাল ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম যেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় সুরাইয়া নূর ইসলামিক সেন্টারকে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সেখান থেকে বাঁশখালী উপযেলাধীন বন্যা প্লাবিত ছনুয়া ইউনিয়নের চকলাপাড়া, ছেনবনগ্রামের ৩০০টি পরিবারের নিকট ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।

১৫ই জুলাই বুধবার চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার : অদ্য দুপুর ১-টায় চট্টগ্রাম যেলার সাতকানিয়া উপযেলার ত্রাণ বিতরণ সাব-সেন্টার কেরানীহাটের আনুফকিরের দোকান থেকে মোট ২৫০টি পরিবারের নিকট ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। অতঃপর দায়িত্বশীলগণ রওয়ানা হন পরবর্তী সাব-সেন্টার যেলার লোহাগাড়া উপযেলায়। সেখান থেকে প্রায় ৩০০টি পরিবারের নিকট ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়। অতঃপর তারা রওয়ানা হন পরবর্তী সাব-সেন্টার কক্সবাজারের চকরিয়া উপযেলার ভাঙারমুখ বাজারে। সেখানেও প্রায় প্রায় ২৫টি পরিবারের নিকট ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। দায়িত্বরত কর্মীবৃন্দ প্লাবিত বানভাসি মানুষদের নিকট সুশৃংখলভাবে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেন।

উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, সাংগঠকি সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান। এছাড়াও চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সাদী, যেলা যুবসংঘের সভাপতি জসীমুদ্দীন, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক বেলাল হোসাইন, ফেনী যেলা পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি ছাদিকুন নূর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, উক্ত ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাবতীয় শিরক ও বিদআত হ'তে বেঁচে থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া হয়। বাঁশখালী উপযেলার ছনুয়া ইউনিয়নের বন্যার্তদের ভাষ্যমতে, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দুর্গম অঞ্চল হওয়ায় সকলেই সামনের বানভাসী এলাকায় ত্রাণ দিয়েই ফিরে যায়। তাদের নিকট কেউ আসতে চায় না। 'আন্দোলন'-এর ত্রাণসামগ্রী তাদের নিকট পৌঁছাতে এলাকাবাসী অনেক খুশী হন ও সংগঠনের জন্য দো'আ করেন।

মাসিক ইজতেমা

২৬শে জুন শুক্রবার রংপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মতীউর রহমান। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং বাদ মাগরিব সদর থানাধীন খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন। এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর

সভাপতি আব্দুল করীম এবং সহ-সভাপতি আতীকুর রহমান।

২৭শে জুন শনিবার পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা দারুলহাদীছ কমপ্লেক্স মাদ্রাসা ময়দানে এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

মাদ্রাসা উদ্বোধন

১লা জুলাই বুধবার রিশিকুল, গোদাগাড়ী, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন রিশিকুল ঈদগাহ হাফেযিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি তাইয়েব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি কামাল হোসাইন।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ গত ১৯-২১শে জুন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন ঝিনা, উপরবিল্লী, বিবির ডাইং, সেরাপাড়া, পাঁচগাছিয়া ও কেশবপুর; ২৫-২৬ জুন ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার মুক্তাগাছা থানাধীন চাঁনপুর, দুল্লা ও সদর থানাধীন গোলপুকুর পাড়; ২৬-২৯ জুন গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সোহাদিয়া, সদর থানাধীন কাথোরা, ইপসা, মাস্টারবাড়ী ও জোলারপাড়; ২৯ জুন-১লা জুলাই নরসিংদী যেলার সদর থানাধীন চৌয়া, তেঁতুলিয়া, হাটখোলা, কেন্দুয়াব বাজার, পাঁচদোনা বাজার, সর্পনিগের, পাথরপাড়া, চাঁনগাঁও, পাইকারদী ও সৈকাদী; ২-৪ জুলাই নারায়ণগঞ্জ যেলার সোনাগাঁও থানাধীন কোনাবাড়ী, মূসারচর, গণকবাড়ী, বস্তল পশ্চিমপাড়া; রূপগঞ্জ থানাধীন পূর্বাচল ১নং সেক্টর, বাকবেড়, বালু দক্ষিণপাড়া, দেইলপাড়া ও নাওয়াড়া; ৪-৭ জুলাই ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার বেরাইদ পূর্বপাড়া, চিনাদীপাড়া, ছোট বেরাইদ, আরাইদ্দাপাড়া, ভুঁইয়াপাড়া, টেকপাড়া, নাছিরাবাদ মধ্যপাড়া, নাছিরাবাদ, ত্রিমোহনী ও দোলেশ্বর এলাকায় তাবলীগী সফর করেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

'আশূরায়ে মুহাররম : ইতিহাস ও শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনার

২৪শে জুন বুধবার, নওদাপাড়া, রাজশাহী : নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে অদ্য বিকাল ৫টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে প্রথমবারের মত 'আশূরায়ে মুহাররম : ইতিহাস ও শিক্ষা' বিষয়ক মাসিক গবেষণা সেমিনার-১ অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেম'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। প্যানেল আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অতঃপর প্রধান আলোচক আশূরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, নবী-রাসূলগণের যুগে এর তাৎপর্য, আশূরার বিকৃত ইতিহাস, মুহাররম সংক্রান্ত অনৈসলামিক কার্যকলাপ এবং পরিশেষে সমকালীন জীবনে আশূরার শিক্ষা নিয়ে বিশদ আলোকপাত করেন। পরবর্তীতে প্যানেল আলোচক ও সভাপতি মহোদয় বিষয়টির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করেন সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, যা সেমিনারকে ইলমী আবহে আরো প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলে। উক্ত সেমিনারে গবেষণা বিভাগের গবেষকবৃন্দ ছাড়াও অত্র মারকাযের শিক্ষক, গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের জুনিয়র গবেষণা সহকারী এবং কো-অর্ডিনেটর মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ।

মারকায সংবাদ

নতুন প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ

২রা জুলাই বৃহস্পতিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে মারকাযের নতুন প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার মাদানী। তার দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং মারকায নির্বাহী পরিচালনা কমিটির পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা, ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও ৭নং সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মাদ আয়নুল হক (৭৯) গত ২৬শে জুন রোজ শুক্রবার সকাল ১০-টায় নিজ বাড়ীতে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও সাংগঠনিক সাথী রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টায় তার নিজ বাসস্থান যেলার কাযীপুর থানাধীন পশ্চিম দুবলাই সামাজিক গোরস্থান সংলগ্ন ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ আল-আমীন। জানাযা শেষে তাকে উক্ত গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা, সহ-সভাপতি শফীউল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রাসেল মাহমূদসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল, কর্মী এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাত কামনা করছি ও শোকহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর?

ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)
লিখিত প্রশ্ন করুন - www.at-tahreek.com/qa

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : পিতা যদি গুনাহে জারিয়ার পথ খোলা রাখা অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে পুত্রের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কাজ কোনটি হবে? পিতার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করা নাকি গুনাহের পথ বন্ধ করা? এক্ষেত্রে যতদিন এই গুনাহ চালু থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কি পিতার কবরে আযাব হ'তে থাকবে?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : প্রথমে গুনাহে জারিয়া বা চলমান গুনাহের পথ বন্ধ করতে হবে। এরপর ছাদাক্বায়ে জারিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ফলে ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা বশে বিভ্রান্ত করেছে তাদের পাপভার। দেখ কতই না নিকৃষ্ট সে ভার, যা তারা বহন করবে' *(নাহল ১৬/২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্য থাকবে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহ। তবে এতে তাদের গুনাহের কোন অংশ কমবে না' *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*। আর কোন ব্যক্তি পাপ কাজ চলমান রেখে মারা গেলে তার কবরে আযাব হ'তে থাকবে। যেমন পৃথিবীতে কোন মানব হত্যা হ'লে সে গুনাহের একটি অংশ আদম (আঃ)-এর বড় সন্তান ক্বাবীলের আমলনামায় যোগ হবে *(বুখারী হা/৩৩৩৫; মিশকাত হা/২১১)*।

প্রশ্ন (২/৪০২) : অনেকের ধারণা নবী করীম (ছাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত স্থান বি'রে শিফা' বা আরোগ্যের কূপ-এর পানি পান করলে আরোগ্য লাভ হয়। উক্ত বিশ্বাস কি সঠিক?

-বায়েযীদ ইসলাম আলাভী, গাযীপুর।

উত্তর : বি'রে শিফা'র পানি পান করলে বিশেষভাবে আরোগ্য লাভ হবে এ বিশ্বাসের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। এই নামে কোন কূপের কথা বিশুদ্ধ কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। বরং কেউ কেউ বি'রে ইয়াসীরা নামে এক কূপের কথা বলেছেন যার পূর্ব নাম ছিল আশীরা। এটা আবার বি'রুল ইহন নামেও পরিচিত। অনেকে এটাকেই বি'রে শিফা নামে অভিহিত করেছেন। অতএব সকলের উচিত রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা, বৈধ চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং যেসব বিষয়ে শরী'আতে শিফার ফযীলত প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোর ওপর নির্ভর করা। ভিত্তিহীন বরকতের বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(আলবানী, আত-তাওয়াসসুল পৃ. ১৪৭)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : স্ত্রীর উপার্জন হারাম মিশ্রিত। কিন্তু তা স্বামীর সংসারে ব্যয় করেন না। সম্পূর্ণ আয় স্ত্রীর পিতা-মাতার সংসারে ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে স্বামী কোনভাবে দায়ী হবেন কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : স্ত্রীর উপার্জন হারাম-মিশ্রিত হ'লে শুধু এ কারণে স্বামী দায়ী হবেন না *(আন'আম ৬/১৬৪; নাজম ৫৩/৩৯)*। তবে তিনি যদি হারাম কাজে সহযোগিতা করেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকেন বা তা অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করেন, তাহ'লে সেই সহযোগিতার কারণে তিনি গুনাহগার হবেন *(মায়েদাহ ৫/২)*। উল্লেখ্য যে, হারাম পন্থায় উপার্জন করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ খাদ্য-বস্ত্র হারাম হ'লে ইবাদত কবুল হবে না *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : জনৈক আলেম বলেন, আলী (রাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পা ছুঁয়ে সালাম করেছেন। এর সত্যতা আছে কি এবং এরূপ করা যাবে কি?

-আবু রায়হান, পলাশবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত আছারটি যঈফ *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭৬, সনদ যঈফ)*। পা ছুঁয়ে সালাম করা শরী'আত পরিপন্থী কাজ এবং এটি বিধর্মীদের রীতি-নীতির অনুকরণ মাত্র। বরং সাক্ষাতে কেবল সালাম বিনিময় করবে। একদা আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যখন তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে কি তার জন্য মাথা ঝুঁকাবে? তিনি বললেন, না। আনাস (রাঃ) বললেন, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা কোলাকুলি করবে বা চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। বরং তার সাথে মুছাফাহা করবে *(তিরমিযী হা/২৭২৮, ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২, মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)*।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : ওষুধের মধ্যে যে জিলাটিন ব্যবহার করা হয় তা যদি হারাম প্রাণী থেকে তৈরীকৃত হয় তাহ'লে সেই ঔষুধ খাওয়া যাবে কি?

-শরীফ, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : জিলাটিন হ'ল প্রাণীর দেহের কোলাজেন নামক এক ধরনের প্রোটিনজাত পদার্থ। ক্যাপসুলের খোসা বা বিভিন্ন সিরাপ ও ট্যাবলেটে জিলাটিনের ব্যবহার খুবই সাধারণ। এক্ষণে জিলাটিন হালাল প্রাণী থেকে তৈরী হয়ে থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে, তবে হারাম প্রাণী যেমন শূকরের চর্বি থেকে তৈরী হয়ে থাকলে তা নিষিদ্ধ' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/২৬০)*।। তবে বিকল্প হালাল ও কার্যকর ওষুধ পাওয়া না গেলে হারাম প্রাণী থেকে তৈরী জিলাটিন বাধ্যগত অবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর কেউ যদি নিরুপায় হয়ে পড়ে, অবাধ্যতা বা সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে নয়, তবে তার কোন গুনাহ নেই' *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সচেতনতার কারণে অনেক ওষুধ কোম্পানী এখন হালাল জিলাটিন কিংবা উদ্ভিদ থেকে তৈরী ক্যাপসুল (যেমন : HPMC সেলুলোজ দিয়ে তৈরী ক্যাপসুল) ব্যবহার করছে। তাই সম্ভব হ'লে ওষুধ কেনার সময় বা ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন নেওয়ার সময় হালাল বা ভেজিটেরিয়ান বিকল্প আছে কিনা তা জেনে নেওয়া উত্তম।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : কিছু মাদ্রাসায় আরবী বিষয়ে পুরুষ আলেম এবং সাধারণ বিষয়ে নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।

এছাড়া প্রশাসনিক প্রয়োজনে নারী-পুরুষ শিক্ষকরা একসঙ্গে বৈঠকও করেন। এভাবে নারী শিক্ষকদের নিয়োগ ও নারী-পুরুষ একত্রে বসে যৌথ সভা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

-আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : একই প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও নারীদের অবাধে মিশে চাকুরী করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা এতে নৈতিক অবক্ষয় এবং কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে, যা শেষ পর্যন্ত অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দিকে ধাবিত করে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/১৬৪-৬৫)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা যখন তাদের (নবী-পত্নীদের) কাছে কোন ব্যবহারের সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটি তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার মাধ্যম' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। তবে বাধ্যগত অবস্থায় এরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে হ'লে পূর্ণ শারঈ পর্দা বজায় রাখতে হবে *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২৩/২)*। সেক্ষেত্রে পৃথক অফিস, পৃথক স্টাফ রুম, অনলাইন বা পর্দাসহ বৈঠক এবং পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা সীমিত রাখা প্রভৃতি ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। এতে শরী'আতের উদ্দেশ্য বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। আর কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকলে সেখানে তাদের চাকুরীতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : *আমি নৌবাহিনীতে চাকরি করি। আমাদের প্রতিদিন এক প্যাকেট করে সিগারেট দেওয়া হয়। চাইলে আমি তা গ্রহণ করতে পারি, আবার নাও করতে পারি। এ অবস্থায় সিগারেটটি নিয়ে নিজে ব্যবহার না করে যদি বিক্রি করে সেই অর্থ অন্য প্রয়োজনে ব্যয় করি, তাহ'লে তা হালাল হবে কি?*

-তওসীফ আহমাদ, পতেঙ্গা চট্টগ্রাম।

উত্তর : গ্রহণ করবে না। বরং সরাসরি ফিরিয়ে দিবে। কারণ নিজে ধূমপান না করে তা বিক্রি করে সেই অর্থ গ্রহণ করা হারাম। আর যা খাওয়া হারাম, তা থেকে উপকার গ্রহণ করাও হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির ওপর কোন বস্তু খাওয়া (বা ব্যবহার করা) হারাম করেন, তখন তার মূল্য (কেনা-বেচা করে অর্থোপার্জন করাও) তাদের জন্য হারাম করে দেন' *(আহমাদ হা/২২২১; ছহীহুল জামে' হা/৫১০৭)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : *আমি স্বপ্নে খুব বেশী অশ্লীল দৃশ্য দেখি। এর কারণ কি? এজন্য কি আমি গুনাহগার হব?*

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : স্বপ্নে অশ্লীল দৃশ্য দেখার জন্য ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। কারণ মানুষ ঘুমের মধ্যে তার স্বপ্নের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে না। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তির থেকে (আমল লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে... তাদের একজন হ'ল ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জেগে ওঠে' *(আবুদাঊদ হা/৪৩৯৮; মিশকাত হা/৩২৮৭)*। তবে জাগ্রত অবস্থায় যা দেখে, চিন্তা করে বা যে অভ্যাস গড়ে তোলে সে সবকিছু স্বপ্নের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এগুলোর সাথে বাস্তবে জড়িত থাকলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে। সেই সাথে কুচিন্তা মনে আসলে তা সাধ্যমত দূর করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'স্বপ্ন তিন প্রকার : (১) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদমূলক স্বপ্ন, (২) শয়তানের পক্ষ থেকে দুঃখ দেওয়ার জন্য স্বপ্ন, (৩) মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা নিয়ে বেশী চিন্তা করে, তার প্রতিফলন' *(মুসলিম হা/২২৬৩)*। রাত্রিতে শোয়ার সময় চার কুল এবং আয়াতুল কুরসী পড়বেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে একনিষ্ঠ চিত্তে দো'আ করবেন, তিনি যেন অন্যায় স্বপ্ন থেকে হেফাযত করেন। এভাবে করতে থাকলে দ্রুত সময়ে অশ্লীল স্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : *আমার এক মহিলা আত্মীয় তাঁর মেয়ের জামাইকে সঙ্গে নিয়ে ওমরাহ পালন করতে চান। তবে তিনি বাংলাদেশ থেকে এবং তাঁর জামাই লণ্ডন থেকে সঊদী আরবে যাবেন। সেখানে গিয়ে তাঁদের সাক্ষাৎ হবে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে একা সফর করে পরে সঊদী আরবে মাহরামের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এই পদ্ধতিতে তাঁর ওমরা করা যাবে কি?*

-আব্দুছ ছামাদ, সিলেট।

উত্তর : বাংলাদেশ থেকে একদল নারী বা পূর্ণ নিরাপদ কাফেলার সাথে সঊদী আরবে ওমরার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করলে তা জায়েয হবে ইনশাআল্লাহ। শর্ত হ'ল অবশ্যই কোন নির্ভরযোগ্য ওমরাহ গ্রুপ বা বিশ্বস্ত কাফেলার সাথে ভ্রমণ করতে হবে। হাত্তাব (রহঃ) বলেন, যদি হজ্জে যাওয়ার জন্য নারীর কোন মাহরাম বা স্বামী না থাকে, তবে কোন বিশ্বস্ত ও নিরাপদ কাফেলার সাথে তার জন্য ফরয হজ্জ আদায় করার উদ্দেশ্যে বের হওয়া জায়েয *(মাওয়াহিবুল জালীল ২/৫২১)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সহ আধুনিক যুগের একদল বিশিষ্ট বিদ্বান বিশস্ত নারীর দলে ও পুরুষের পূর্ণ নিরাপদ কাফেলায় মহিলাদের ওমরাহ সফরে যাওয়াকে বৈধ মনে করেন *(শরহুল উমদাহ ১/১৭৬; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/২১৪, ২৯/৪৯; মুহাম্মাদ আলী আল-ফারকূস, আল-কালিমাতুশ শাহরিয়া ৮৫)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : *একজন মুসলিম নারী কি বিবাহের সময় কাবিননামায় এমন শর্ত রাখতে পারবেন যে, তার স্বামী তাঁর জীবদ্দশায় অন্য কোন নারীকে বিয়ে করতে পারবেন না?*

-তাহামিম রহমান, মগবাজার, ঢাকা।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা স্বামীর জন্য দুই, তিন বা চার পর্যন্ত বিবাহ বৈধ করেছেন *(নিসা ৪/৩)*। প্রশ্নে বর্ণিত শর্ত পবিত্র কুরআনের উক্ত সাধারণ অনুমতির পরিপন্থী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, তা বাতিল; যদিও তা একশত শর্ত হয়। আল্লাহ্‌র শর্তই অধিক সত্য ও অধিক দৃঢ়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৭৭)*। তবে ইবনু কুদামা সহ একদল বিদ্বান মনে করেন, মুসলিম নারী বিবাহের সময় এ শর্ত রাখতে পারেন যে, স্বামী তার জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিবাহ করবেন না। স্বামী যদি এ শর্ত মেনে বিবাহ করেন, তবে তার জন্য তা পূরণ করা ওয়াজিব। তবে যদি তিনি শর্ত ভঙ্গ করে দ্বিতীয় বিবাহ করেন, তাহ'লে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হবে না; বরং প্রথমা স্ত্রী, স্বামীর শর্ত ভঙ্গের কারণে বিচারকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারেন *(মুগনী ৭/৯৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১১২; আশ-শারহুল মুমতে' ৫/২৪৩)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : অপরাধীকে গণপিটুনি দেওয়া কি ইসলামে বৈধ? অনেক সময় শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। ইসলামী শরী'আতে এ ধরনের গণপিটুনি ও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বৈধ কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : ইসলামে গণপিটুনি (Mob Justice) সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। গণপিটুনির মাধ্যমে কোন নিরপরাধ মানুষ মারা গেলে ইসলামী রাষ্ট্র ক্বিছাছ হিসাবে জড়িত সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে *(বাক্বারাহ ২/১৭৮; নববী, আল-মাজমূ' ২০/৩৪)*। কেননা কোন ব্যক্তি অপরাধী হ'লেও তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই। অপরাধ প্রমাণ, বিচার এবং শাস্তি কার্যকর করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে মারধর করা বা হত্যা করা আরও জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির সর্বাধিক নিকটবর্তী' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষকে যদি কেবল তাদের দাবীর ভিত্তিতেই সবকিছু দিয়ে দেওয়া হ'ত, তাহ'লে কিছু মানুষ অন্য মানুষের জীবন ও সম্পদ দাবী করে বসত। কিন্তু ইসলামী বিধানে প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব দাবীদারের, আর যে তা অস্বীকার করবে, তার উপর শপথ ওয়াজিব হবে' *(বুখারী হা/৪৫৫২; মিশকাত হা/৩৭৫৮)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : মযলূম ব্যক্তি যদি কাফের হয়, তাহ'লে তার বদ দো'আর কারণে কোন মুসলিম পাপী হবে কি বা তার কোন ক্ষতি হবে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : হ্যাঁ পাপী হবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। আর কোন অমুসলিম যদি মুসলিম দ্বারা অত্যাচারিত হয় আর সে বদদো'আ করে তাহ'লে সেই মযলূমের বদদো'আ আল্লাহ্র কাছে কবুল হ'তে পারে। এর ফলে যালিম মুসলিম দুনিয়া বা আখেরাতে শাস্তি পেতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যুলুমকে হারাম করেছেন এবং মযলূমের দো'আ মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মযলূমের বদদো'আ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা তার দো'আ এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা নেই' *(বুখারী হা/১৪৯৬; মিশকাত হা/১৭৭২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমরা মাযলূমের বদদো'আ থেকে বেঁচে থাক, সে যদি কাফেরও হয়। কারণ তার বদদো'আ এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন আড়াল বা পর্দা থাকে না' *(ছহীহাহ হা/৭৬৭, ২২২৯)*। অন্য বর্ণনায় ফাজের বা পাপাচারীর কথাও বলা হয়েছে *(ছহীহুত তারগীব হা/২২২৯)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : কুরআনী বিধান অনুযায়ী কোন নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের ক্ষেত্রে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী হাযির করা আবশ্যক। কিন্তু ধর্ষণের ক্ষেত্রে যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তাহ'লে অপরাধীর বিচারকার্য কিভাবে সম্পন্ন হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ব্যভিচার এবং ধর্ষণ দু'টি ভিন্ন অপরাধ। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন পুরুষ সাক্ষীর যে শর্ত রয়েছে, ধর্ষণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ ধর্ষণ একটি সহিংস অপরাধ ও যুলুম। তাই তার প্রমাণ ও অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য বিচারক পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। যেমন অপরাধীর স্বীকারোক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাক্ষ্য, শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক প্রমাণ, চিকিৎসা প্রতিবেদন ও শারীরিক আলামত, আধুনিক যুগে ডিএনএ পরীক্ষা সহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ গ্রহণযোগ্য, যদি বিচারক তা নির্ভরযোগ্য মনে করেন *(দ্র. বুখারী হা/৬৮৩০; মুসলিম হা/১৬৯১; মিশকাত হা/৩৫৫৭)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রহণ করা যাবে কি? এজেন্ট হিসাবে অ্যাকাউন্ট খোলা, ফিক্সড ডিপোজিট, জমা-উত্তোলন, টাকা স্থানান্তরসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবার বিপরীতে কমিশন দেওয়া হয়; তবে কোন ঋণ কার্যক্রম থাকে না। এক্ষেত্রে আমি এজেন্সি নিতে পারব কি?

-গোলাম কবীর, সেনবাগ, নোয়াখালী।

উত্তর : বাংলাদেশে কোন ব্যাংকই শতভাগ সূদমুক্ত নয়। তাই সব ধরনের ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারণ বাহ্যিকভাবে ঋণের কার্যক্রম না থাকলেও এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচালনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সূদী বা সূদভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে সহযোগিতা করা হয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৩১০, ৩৬৫)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : আমার পিতা নিয়মিত ছালাত আদায় করেন না এবং আমার পরিবারের প্রায় সকলেই কবিরাজ বা হিন্দু তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে জাদু-টোনা করান। কিছুদিন আগে আমার জন্য একজন দ্বীনদার পাত্রের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। আমি ঐ পাত্রকেই বিয়ে করতে আগ্রহী। কিন্তু পিতা এতে রাযী নন। এমতাবস্থায় আমি আমার কোন নিকটাত্মীয়কে সাক্ষী রেখে নিজের সিদ্ধান্তে ঐ ছেলেকে বিয়ে করতে পারব কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে পিতার অনুমতি আবশ্যক। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে নারী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করল তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(তিরমিযী হা/১১০২; আবুদাউদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১)*। তবে দুনিয়াবী কারণে পিতা মেয়ের বিবাহ দিতে টালবাহানা করলে এবং তা সুস্পষ্ট হ'লে সাবালিকা মেয়ে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার সৎ নিয়তে পরবর্তী অভিভাবক তথা দাদা, ভাই, চাচার অভিভাবকত্বে বা আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু কোনভাবেই নিজের অসৎ মনস্কামনা পূরণার্থে পিতাকে পাশ কাটিয়ে অন্যকে অলী বানিয়ে বিবাহ করা যাবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৭-৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/১৪৭)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : কবরে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্বাতীফা বা মখমল/রেশমী কাপড় দেওয়া যাবে কি? ছহীহ মুসলিমে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরে লাল ক্বাতীফা দেওয়ার ঘটনা এসেছে। এটি কি শুধু তাঁর জন্য খাছ ছিল, নাকি সাধারণ মুসলিমদের জন্য জায়েয?

-তাজমুল খান, পূর্ব বর্ধমান, ভারত।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির কবরে লাল ক্বাতীফা (قَطِيفَة) বা মখমল কাপড় বিছানো সুন্নাত নয়। বরং অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এটি অপ্রয়োজনীয় এবং মাকরূহ। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর কবরে সেটা দেওয়া হয়েছিল বিশেষ কারণে। ইমাম নববী বলেন, বিজ্ঞ আলেমদের মতে, রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্তদাস শুক্বরান (রাঃ) মূলত নিজের ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতেই এটি করেছিলেন। ছাহাবীগণের মধ্য থেকে কেউ তাঁর এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হননি এবং তাঁরা তার এই কাজটির কথা জানতেনও না *(মির'আত ৫/৪২৭)*। তিনি আরো বলেন, এই মখমলের চাদরটি শুক্বরান (রাঃ) কবরের নীচে ফেলেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর পর এটি অন্য কেউ পরিধান বা ব্যবহার করুক তা আমি পসন্দ করি না' *(শরহ মুসলিম ৭/৩৪)*। আবার কোন কোন বিদ্বান এটাকে রাসূলের জন্য খাছ মনে করেন। আবার কেউ বলেন, এটা বের করে নেওয়া হয়েছিল *(মির'আত ৫/৪২৭)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মৃত ব্যক্তির নীচে তার কবরে কোন কাপড় বা চাদর বিছানোকে অপসন্দ করতেন *(বায়হাক্বী, হা/৬৭২২; তোহফা ৪/১২৭)*। অতএব উক্ত হাদীছ দ্বারা কবরে চাদর বিছানোর দলীল নেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : আমি একজন দ্বীনদার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মেয়ের পর্দা দেখে দ্বীনদারী বুঝা যায় না। এক্ষেত্রে একজন দ্বীনদার স্ত্রী পাওয়ার জন্য আমি কি কি আমল করব এবং পাত্রীর বাহ্যিক কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব?

-মুহাম্মাদ হানীফ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : দ্বীনদার স্ত্রী লাভের জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ্র কাছে আন্তরিকভাবে দো'আ করতে হবে। পাত্রীর বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের প্রতি যত্নশীলতা, শারঈ পর্দার প্রতি আন্তরিকতা, কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের আগ্রহ, উত্তম আখলাক, সত্যবাদিতা, লজ্জাশীলতা, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ এবং দ্বীনদার পরিবেশে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া যরূরী। এক্ষেত্রে তার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বিশ্বস্ত দ্বীনদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া যেতে পারে। একই সঙ্গে পাত্রেরও উচিত নিজের ঈমান, তাক্বওয়া ও চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা। কেননা আল্লাহ বলেন, 'পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য' *(নূর ২৪/২৬)*। এক্ষণে বিয়ের জন্য কোন নারীর সন্ধান পেলেও ইস্তেখারার মাধ্যমে প্রকৃত দ্বীনদার পাত্রী পেতে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়, আল্লাহ তার জন্য উত্তম জীবনসঙ্গীর ব্যবস্থা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ *(বিস্তারিত দ্র. 'দ্বীনদার জীবনসঙ্গী লাভের উপায় ও করণীয়', আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০২৫; 'বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন' বই)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : হাদীছে এসেছে যে, ক্বিয়ামত জুম'আর দিনে সংঘটিত হবে। প্রশ্ন হ'ল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেহেতু জুম'আর দিন একসাথে শুরু হয় না, তাহ'লে কোন দেশের সময় অনুযায়ী জুম'আর দিন ধরা হবে?

-ছাব্বীর আহমাদ, বগুড়া।

উত্তর : 'ক্বিয়ামত জুম'আর দিন সংঘটিত হবে। হাদীছে যেভাবে এসেছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এক্ষণে আল্লাহ তা'আলা এমন সময়েই ক্বিয়ামত সংঘটিত করবেন, যা তাঁর হিকমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যে মুহূর্তে পৃথিবীর কোন অংশে জুম'আর দিন বিদ্যমান থাকবে। তাই এ বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া আল্লাহ তা'আলার গায়েবী জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর ক্বিয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র এবং নক্ষত্রমণ্ডলী ও গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথসহ এই মহাবিশ্বের বর্তমান নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সুতরাং সেই দিনটিকে আমাদের এই দুনিয়ার সাধারণ দিনগুলোর সাথে পরিমাপ বা তুলনা করা যাবে না।

মূলত পৃথিবীতে সময় অঞ্চল (টাইম জোন) তৈরী হয় সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থান এবং পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনের (আহ্নিক গতি) হিসাবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে অর্থাৎ পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি থমকে যাবে বা উল্টো হয়ে যাবে। ফলে বর্তমানের ২৪ ঘণ্টার টাইম জোনভিত্তিক দিন-রাতের যে নিয়ম আমরা জানি, তা ক্বিয়ামতের সময় আর কার্যকর থাকবে না।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার নির্দিষ্ট কোন আমল আছে কি? বেশী বেশী দরূদ পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্ন দেখা যাবে কি? আর তাঁকে স্বপ্নে দেখার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-আশিক আল-গালিব, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার বিষয়টি ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পাওয়ার জন্য কোন আমল হাদীছে বর্ণিত হয়নি। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার ফযীলত সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ) এতটুকু বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না'। অথবা তিনি বলেছেন, 'সে আমার সাদৃশ্য গ্রহণ করতে পারে না' *(বুখারী হা/৬৯৯৩; মিশকাত হা/৪৬১১)*। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করা, তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করা, তাক্বওয়া অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্র নিকট আন্তরিকভাবে এজন্য দো'আ করা নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ। কিন্তু এগুলোকে রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার নিশ্চিত উপায় মনে করা যাবে না। আরো উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখা নিঃসন্দেহে ভালো স্বপ্ন। আর ভালো স্বপ্ন একান্ত কাছের মানুষ ছাড়া অন্যের সামনে প্রকাশ করা সমীচীন নয়। সুতরাং যারা রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছে বলে প্রচার করে নিজেকে ওলী দাবী করে তারা নিতান্তই বিভ্রান্ত।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : ইসলামে ইয়াতীমের সংজ্ঞা জানতে চাই। পিতা-মাতার যেকোন একজন মৃত্যুবরণ করলেই কি তাকে ইয়াতীম বলা যাবে? কত বছর পর্যন্ত কাউকে ইয়াতীম গণ্য করা যাবে?

-আব্দুর রাক্বীব, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় যে শিশুর পিতা তার বালেগ হওয়ার পূর্বেই মারা গেছে। শুধু মায়ের মৃত্যু হ'লে শারঈ অর্থে তাকে ইয়াতীম বলা হয় না *(বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ৯/২০০)*। আর যখন সে বালেগ হয়ে যায়, তখন তার থেকে ইয়াতীমের বিধান উঠে যায়, যদিও সাধারণ কথাবার্তায় তাকে ইয়াতীম বলা হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাবালক হওয়ার পর আর কোন ইয়াতীমত্ব থাকে না' *(আবুদাউদ হা/২৮৭৩; ছহীহাহ হা/৩১৮০)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : ইসলামী বই রচনার ক্ষেত্রে কপিরাইটের শারঈ বিধান কি? অন্য কোন লেখকের বই থেকে তথ্য বা লেখা গ্রহণ করে যদি তার সূত্র উল্লেখ না করা হয় এবং তা নিজের নামে প্রকাশ করা হয়, তাহ'লে তা কি শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রতারণা বা স্বত্ব লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হবে?

-মা'রূফ হাসান, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বত্ব ও রচনাস্বত্ব একটি সম্মানজনক অধিকার। তাই কোন লেখকের বই, গবেষণাকর্ম বা লেখা থেকে তথ্য, বিশ্লেষণ বা ভাষা গ্রহণ করে সূত্র উল্লেখ না করে নিজের নামে প্রকাশ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রতারণা, মিথ্যা দাবী এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। তবে কুরআন, ছহীহ হাদীছ এবং সর্বজনবিদিত শারঈ তথ্য উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অন্যের মৌলিক রচনা, গবেষণা, ভাষা ও বিন্যাস হুবহু নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া বৈধ নয় *(তাফসীরে কুরতুবী ১/৩)*। আর কোন লেখকের কথা সংক্ষিপ্ত করে বা ব্যাখ্যামূলক নিজের বইয়ে উপস্থাপন করা দোষণীয় নয়। শাওকানী (রহঃ) বলেন, গ্রন্থ সংকলকদের চিরাচরিত স্বভাব বা নিয়ম সর্বদা এটি ছিল যে, পরবর্তী সময়ে আগত একজন লেখক তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের কিতাব বা আলোচনা থেকে সাহায্য নেবেন। অতঃপর তিনি তা থেকে সংক্ষেপ করবেন অথবা অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করবেন, কিংবা কোন বিষয়ে আপত্তি ও পর্যালোচনা পেশ করবেন; অথবা এজাতীয় অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণ করবেন, যা মূলত নতুন কোন গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা বা ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। আর এমন কে আছে, যে কোন বিষয়ে কলম ধরেছে আর সে পূর্ববর্তীদের লেখনী বা বক্তব্য থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেনি? *(আল-বাদরুত্ব ত্বালে' ১/৩৩৩)*। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী লেখকদের কিতাব থেকে তথ্য, দলীল বা বক্তব্য গ্রহণ করা মোটেও দোষের নয়; বরং এটি জ্ঞানচর্চার একটি স্বাভাবিক ও চিরাচরিত নিয়ম। তবে শর্ত হ'ল, যার লেখা বা কিতাব থেকে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, আমানত দারিতার স্বার্থে অবশ্যই তার নাম ও কিতাবের সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে হবে। সূত্র উল্লেখ না করে অন্যের গবেষণাকে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া ইলমী খেয়ানতের শামিল।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : আমরা তিন ভাই পৃথকভাবে সংসার পরিচালনা করি এবং পিতা-মাতাও আলাদা থাকেন। আমরা সবাই মিলে তাঁদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রতি মাসে একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দিয়ে থাকি। এ অবস্থায় আমাদের যাকাতের অর্থ পিতা-মাতাকে দেয়া যাবে কি?

-গুলযার হোসাইন, নওগাঁ।

উত্তর : পিতা-মাতার জন্য নিজ উপার্জিত সম্পদ থেকে খরচ করতে হবে, যাকাত থেকে নয়। এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আরয করল, আমার সম্পদ আছে আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের সর্বোত্তম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্ষণ কর' *(আবুদাউদ হা/৩৫৩০; মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। তবে পিতা-মাতা যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে যান তাহ'লে যাকাতের সম্পদ থেকে তাদের ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে *(ইবনুল মুফলেহ, হাশিয়াতুর রওয ৩/৩৩২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩১১; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১০/২)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : ছেলেদের দাড়ি গজানো বা দাড়ি আরও ঘন করার উদ্দেশ্যে কোন ধরনের কেমিক্যাল বা ওষুধ ব্যবহার করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রায়হান, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : মুমিনের উচিত আল্লাহ তা'আলা তার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। আর যে জিনিস অর্জন বা লাভ করার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তা জোরপূর্বক বা কৃত্রিম উপায়ে হাছিল করার জন্য তার কোন কষ্ট বা বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। আল্লাহ মানুষকে বৈচিত্র্যময় ও বিভিন্ন স্তরের করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যার মুখে একেবারেই দাড়ি গজায় না, কারো দাড়ি উঠতে দেরি হয়, কারো দাড়ি হয় পাতলা, আবার কারো দাড়ি হয় ঘন। অতএব কারো মুখে দাড়ি না গজানোর কারণে তার গুনাহ হবে না এবং এতে মোটেও লজ্জা বা অপমানের কিছু নেই *(ইবনু নাজীম, আল-বাহরুর রায়েক্ব ২/৩০২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৫৮)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : আমি গোপনে দু'জন সাক্ষী ও এক মসজিদের ইমামের উপস্থিতিতে মেয়ের পিতার অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করি। বিয়ের প্রায় ২০ দিন পর স্ত্রীর ঋতুকালীন অবস্থায় তীব্র রাগের মাথায় এসএমএসে ৩ তালাক লিখে ফেলি। তবে আমার তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এসএমএসটি মুছে ফেলি। পরবর্তীতে জানতে পারি যে, অলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হয়। আমরা মাত্র তিন দিন স্বামী-স্ত্রীর মতো একসঙ্গে ছিলাম এবং বর্তমানে উভয়েই নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছি। আমরা দু'জনই বৈধভাবে সংসার করতে চাই। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়নি এবং তালাকও হয়নি। কারণ বিবাহটি অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়াই হয়েছে এবং তাতে রাষ্ট্রীয় কোন স্বীকৃতি নেই। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে নারী তার অভিভাবকের (অলী) অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আবুদাউদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১)*। সুতরাং তারা তাদের কৃত পূর্বের গুনাহের জন্য খালেছ নিয়তে তওবা করবে এবং উক্ত মেয়ের সাথে সংসার করতে চাইলে

অভিভাবকের অনুমতি ও দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীসহ মোহর নির্ধারণ করে নতুনভাবে বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : আমলে ছালেহ বা সৎকর্ম বলতে কি বুঝায়? সকল প্রকার ভালো কাজই কি সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত? কাউকে দুনিয়াবী কোন কাজে সহযোগিতা করা কি আমলে ছালেহ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে?

-আশিক আল-গালিব, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হ্যাঁ, কাউকে দুনিয়াবী কোন বৈধ কাজে সহযোগিতা করাও আমলে ছালেহ-এর অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে, যদি তা শরী'আতসম্মতভাবে হয় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ইবাদত হ'ল এমন একটি ব্যাপক শব্দ যা আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন এবং ভালোবাসেন এমন সমস্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কথা ও কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে *(শরহ লামিয়াহ ৯/১৭)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রতিটি ভালো বা কল্যাণকর কাজই এক একটি ছাদাক্বা বা দানস্বরূপ। আর অন্যতম একটি ভালো কাজ হ'ল তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের পাত্রে কিছু পানি ঢেলে দেওয়া তথা তাকে সাহায্য করা' *(বুখারী হা/৬০২১; মিশকাত হা/১৯১০)*। অতএব আমলে ছালেহ কেবল ছালাত, ছিয়াম, যাকাত বা হজ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শরী'আতসম্মত প্রতিটি কাজ, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। তাই মানুষের দুনিয়াবী বৈধ প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করাও আমলে ছালেহ এবং ছওয়াবের কাজ, যদি তা নেক নিয়তে হয়।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : আল্লাহ সকল ভাষাই বুঝেন, তিনি মনের ভাষাও বুঝেন। তাহ'লে দো'আ আরবীতে করার পিছনে হিকমত কি?

-ছাফা আদুরী, নরসিংদী।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠের নির্দেশনা রয়েছে। কারণ ছালাতে মানুষ নিজ ভাষায় কথা বলতে পারেনা *(মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮)*। এক্ষণে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে আরবীতে দো'আর পিছনে নিম্নোক্ত হিকমত সমূহ থাকতে পারে। যেমন : প্রথমত এর মাধ্যমে উম্মতের বিশ্বজনীন ঐক্য ফুটে ওঠে, যার মাধ্যমে একই ভাষায় সবাই তাদের রবের কাছে প্রার্থনা করে। দ্বিতীয়ত কুরআন ও সুন্নাহ্র ভাষায় দোআ করা হয়, যা সর্বাধিক অর্থপূর্ণ ও সারগর্ভ। তৃতীয়ত আরবী ভাষায় কুরআন ও সুন্নাহ নাযিল হয়েছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পসন্দনীয় ভাষা। চতুর্থত আরবী দো'আ অর্থ বুঝে পাঠ করলে তা হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। অবশ্য ছালাতের বাইরে বান্দা তার মাতৃভাষায় স্বীয় প্রভুর নিকটে যে কোন বৈধ দো'আ করতে পারে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন ৬০)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : খাবারের মধ্যে চুল, মাছি, পোকা বা অন্য কোন অরুচিকর বস্তু পড়ে গেলে সেই খাবার ফেলে দেওয়া যাবে কি? এতে কি খাদ্য অপচয়ের গুনাহ হবে?

*-*লিটন, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

**[আরবীতে সুন্দর ও অর্থবহ ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : খাবারের মধ্যে চুল, মাছি, পোকা-মাকড় বা অন্য কোন অপবিত্র বা অরুচিকর বস্তু পড়ে গেলে তার বিধান এক নয়; বরং পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন হবে। যদি বস্তুটি সরিয়ে ফেলাতে খাবার নিরাপদ ও খাওয়ার উপযোগী থাকে, তাহ'লে শুধু ঐ বস্তুটি অপসারণ করে বাকী খাবার খেয়ে নিবে। অযথা পুরো খাবার ফেলে দেওয়া অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কারো পাত্রের মধ্যে যদি মাছি পড়ে, তবে সে যেন তা সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর তা বাইরে ফেলে দেয়। কারণ তার এক ডানায় রয়েছে রোগ এবং অপর ডানায় রয়েছে তার প্রতিষেধক। আর সে পাত্রে পড়ার সময় রোগবাহী ডানাটি দিয়েই প্রথমে পড়ে। সুতরাং তোমরা তাকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দাও, তারপর ফেলে দাও' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪১১৫, ৪১৪৩)*। কিন্তু যদি পতিত বস্তুটির কারণে খাবারটি নষ্ট হয়ে যায়, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মনে হয় বা খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায় বা চরম অরুচি চলে আসে, তাহ'লে তা খাওয়া থেকে বিরত থাকবে; বরং ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্ষতি করোনা, ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : আমি শুনেছি, কুল্লামার কসম করে তা ভঙ্গ করলে ভবিষ্যতে যখনই বিয়ে করা হবে তখন স্ত্রী স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালাক হয়ে যাবে। কিছুদিন আগে একটি পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে আমি মুখে উচ্চারণ করে কুল্লামার কসম করেছিলাম। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যেই কসম ভঙ্গ হয়ে যায়। এই কসম ভঙ্গ করার কারণে ভবিষ্যতে আমার বিয়ের পর স্ত্রী স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালাক হয়ে যাবে কি?

-মনির হোসাইন, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এগুলো ভিত্তিহীন। 'কুল্লামার কসম' নামে শরী'আতে কিছুই নেই। এটি কোন কোন এলাকায় প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। এর দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভবিষ্যৎ স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে এ বিশ্বাসের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। বরং কেউ কসম করে ভঙ্গ করলে তাকে কাফফারা দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এরূপ শপথ ভঙ্গের কাফফারা হ'ল, দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করা যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাইয়ে থাক অথবা অনুরূপ মানের পোষাক প্রদান করা অথবা একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যে ব্যক্তি এতে সক্ষম হবে না, সে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে। এটাই তোমাদের শপথ সমূহের কাফফারা যখন তোমরা তা করবে' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

উল্লেখ্য যে, শপথ কেবল আল্লাহ্র নামেই করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যের নামে শপথ করে, সে কুফরী করে অথবা শিরক করে' *(তিরমিযী হা/৩৪১৯)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : কোন বিবাহিত নারী তার স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকা অবস্থায় যদি নিজ সম্মতিতে

অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাহ'লে শরী'আতের দৃষ্টিতে তাকে বিবাহ করা বৈধ হবে কি?

-ফরহাদ, হবিগঞ্জ।

উত্তর : কোন নারীর স্বামী থাকা অবস্থায় অন্য কোন পুরুষের জন্য তাকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম। এমনকি কোন নারী তার স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তার ইদ্দতকালে তাকে বিয়ে করা হারাম *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/১৩)*। আল্লাহ বলেন, 'এবং বিবাহিতা নারীগণও (তোমাদের জন্য হারাম), তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত' *(নিসা ২৪)*। অতএব যার স্বামী বিদ্যমান, তাকে অন্য পুরুষের জন্য বিবাহ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : কুর্দীদের পরিচয় ও আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-ছদরুদ্দীন, এলিফ্যান্ড রোড, ঢাকা।

উত্তর : কুর্দীরা পশ্চিম এশিয়ার একটি নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী। জনসংখ্যা প্রায় পৌনে তিন কোটি। তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আর্মেনিয়ায় এদের আবাসস্থল। কুর্দি এদের প্রধান ভাষা। এদের অধিকাংশই (প্রায় ৯০%) সুন্নী মুসলিম এবং শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী। কিছু সংখ্যক ছূফী, শী'আ ও খৃষ্টান রয়েছে। বিভিন্ন দেশে তারা তাদের এলাকাসমূহকে 'কুর্দিস্তান' নামকরণ করলেও, তাদের কোন স্বাধীন রাষ্ট্র নেই। বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ী প্রখ্যাত সেনানায়ক সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী ছিলেন কুর্দী ভাষী। কুর্দীরা ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী হওয়ায় তাদের আক্বীদা নিয়ে পৃথকভাবে কোন আলোচনার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : আমরা জানি যে, হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ, শিমারসহ চিহ্নিত অনেকেই সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু খলীফা হিসাবে ইয়াযীদ এই হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার করেননি। প্রশ্ন হ'ল তিনি কেন হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার করেননি? এ থেকে কি বুঝা যায় যে, উক্ত হত্যাকাণ্ডে ইয়াযীদের সম্মতি ছিল?

-আব্দুল্লাহ মাহমূদ ছালেহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : হোসাইন (রাঃ) আহলে বায়তের সম্মানিত সদস্য এবং জান্নাতে যুবকদের নেতা *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) যেভাবে তাঁর সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি আহলে বায়তের আদর্শ অনুসরণ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে, ইয়াযীদ সরাসরি হোসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই। আবার এটিও সত্য যে, তিনি হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কেন তিনি বিচার করেননি এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন ঐতিহাসিক তথ্য নেই। অতএব অনুমান করে বলা যাবে না যে, তিনি বিচার না করায় অবশ্যই হত্যাকাণ্ডে সম্মত ছিলেন। আবার তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলারও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। সেজন্য ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইয়াযীদ মুসলিম রাজন্যবর্গের মধ্যে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর যেমন ভালো কাজ রয়েছে, তেমনি মন্দ কাজও রয়েছে। তাঁর জন্ম ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালের পূর্বে হয়নি। তবে তাঁর শাসনামলেই সেই সব বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল যেমন হোসাইন (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাত এবং মদীনা আক্রমণ ও সেখানে ছাহাবীদের রক্তপাত। তিনি যেমন কোন ছাহাবী ছিলেন না, তেমনি আল্লাহ্র কোন নেককার অলীও ছিলেন না। আর এটিই হ'ল সাধারণ বিবেকবান মানুষ, দ্বীনের আলেম সমাজ এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সামগ্রিক অভিমত *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৪/৪৮৩)*।

তিনি আরো বলেন, 'আর এই কারণেই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং আহলুস সুন্নাহ্র অনুসারীগণ যে আদর্শ ও বিশ্বাসের ওপর একমত হয়েছেন তা হ'ল ইয়াযীদকে যেমন গালিগালাজ বা অভিশাপ দেওয়া যাবে না, ঠিক তেমনি তাকে বিশেষভাবে ভালোবাসাও যাবে না *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩/৪১২)*।

তিনি আরো বলেন, ইয়াযীদ ইবনে মু'আ'বিয়া হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডে মোটেও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি; বরং তাঁর শাহাদাতের খবরে তিনি দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করেছিলেন। আর এটিও নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, ইয়াযীদ সরাসরি হোসাইন (রাঃ)-কে আক্রমণের নির্দেশ দেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরবর্তীতে তাঁর হত্যাকারীদেরকে এই জঘন্য অপরাধের জন্য কোন শাস্তিও দেননি। কারণ তারা ইয়াযীদের রাজত্ব সুরক্ষার জন্যই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল' *(মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/৪১২)*।

সেজন্য ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইবনু কাছীর, ইমাম যাহাবীসহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিদ্বানগণ বলেন, ইয়াযীদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের কারণে আমরা তাকে ভালোবাসবো না, আবার তিনি কনস্টান্টিনপল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ এবং হাদীছে লা'নত বা গালিগালাজ নিষিদ্ধের কারণে তাকে লা'নতও করব না *(আল-বিদায়াহ ৮/২৩২; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৩৬, ৫/৫; বিস্তারিত দ্র. 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : আমাদের এলাকার মসজিদে আযানের আগে 'আছ-ছালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' পাঠ করা হয়। আযানের আগে এভাবে পাঠ করা যাবে কি?

-আল-আমীন, ভৈরবপুর।

উত্তর : এগুলি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। শুধু ফজর নয়, কোন আযানের পূর্বেই দরূদ পাঠ, কুরআন পাঠ বা আহ্বানসূচক অন্য কিছু পাঠ করা বা বক্তব্য রাখা কিছুরই কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের স্বর্ণযুগে তথা সালাফে ছালেহীনের আমলে এগুলির কোন প্রচলন ছিল না *(ইবনু হাজার হায়তামী, আল ফাতাওয়াল ফিক্বহিয়াল কুবরা ১/১৩১; বিস্তারিত দ্র. 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : মোহরানার সম্পদের হকদার স্ত্রী না তার পিতা? পিতা সে টাকা ব্যবহার করলে পরে তা ফেরত দিতে হবে কি?

-আযীযুল হক, নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত সম্পদের হকদার স্ত্রী *(নিসা ৪/৪)*। স্ত্রী চাইলে স্বীয় পিতাকে হাদিয়া হিসাবে দিতে পারে এবং পিতাও চাইলে ঋণ হিসাবে কিছু নিতে পারে। তবে পিতা নিজের মনে করে

উক্ত টাকা ভোগ করতে পারবে না।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : অনেকে ফরয ছালাত শেষে মাথায় হাত রেখে কিছু দো'আ পাঠ করেন। অতঃপর হাতে ফুঁ দিয়ে চোখে-মুখে ও শরীরে বুলিয়ে নেন। এ ধরনের কোন দো'আ বা আমলের ভিত্তি আছে কি? নাকি এটি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত?

-আছিফ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : ফরয ছালাত শেষে মাথায় হাত রেখে নির্দিষ্ট দো'আ পড়া, হাতে ফুঁক দিয়ে চোখে-মুখে বা শরীরে হাত বুলানো সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এটিকে নিয়মিত ইবাদত হিসাবে পালন করা বিদ'আত। তবে ঘুমানোর আগে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে শরীরে হাত বুলানো ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/৫০১৭; মিশকাত হা/২১৩২)*। তাছাড়া অসুস্থ হ'লে এই সূরাগুলো পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে রোগীর শরীরে হাত বুলানো ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/৫৭৩৫)*। উল্লেখ্য যে, কিছু মুছল্লী ফরয ছালাত শেষে মাথায় হাত রেখে 'ইয়া মুজীবু, ইয়া মুজীবু' পাঠ করে থাকেন, যারও কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : স্ত্রী সহবাসের দো'আ কেবল স্বামীকে না স্ত্রীকেও পাঠ করতে হবে? অনেক সময় স্বামী পড়তে ভুলে যেতে পারেন সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে পড়ে নেয়াই উত্তম হবে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সহবাসের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য উক্ত দো'আ পাঠ করা মুস্তাহাব *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ৮/৩৫৭)*। তবে মৌলিকভাবে এই দো'আ পাঠের জন্য স্বামীকে সম্বোধন করা হয়েছে *(বুখারী হা/১৪১; মিশকাত হা/২৪১৬)*। এক্ষণে স্বামী দো'আ পড়তে ভুলে গেলে স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : আমার দাদার মৃত্যুর পর আমার পিতা ও ফুফুরা মারা গিয়েছেন। এখন আমার ফুফুদের সন্তানেরা কি আমার দাদার সম্পত্তিতে কোন অংশ পাবেন?

-কামারুযযামান, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : পিতা ও ফুফুরা যেহেতু দাদার মৃত্যুর পর মারা গেছেন, অতএব তারা সকলে পিতার সম্পত্তিতে অংশীদার হবেন। সে হিসাবে বর্তমানে ফুফুর সন্তানেরা তাদের মায়ের মীরাছ যথাযথভাবে পাবে। তাদের বঞ্চিত করা হ'লে গুনাহ হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/২০২)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক' *(নিসা ১১)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : কোন অমুসলিম বন্ধুর বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : সামাজিক কারণে অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু তাদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(বাক্বারাহ ১৭৩)*। তবে যেহেতু তাদের অনুষ্ঠানে অনৈসলামিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে তাই এরূপ অনুষ্ঠানে যাওয়া বিরত থাকাই উচিত। উল্লেখ্য যে, তাদের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(আলে ইমরান ২৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরও আমার কোন নির্দিষ্ট রোগ ধরা পড়েনি। ডাক্তার বলেছে আমার মানসিক সমস্যা আছে। অন্যদিকে একজন রাক্বী বলেছেন আমার উপর জাদু করা হয়েছে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, রাজশাহী।

উত্তর : মানসিক ডাক্তার দেখানোর পাশাপাশি একজন তাওহীদবাদী রাক্বীর (ঝাড়ফুঁককারীর) নিকট চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে। কারণ কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক ঝাড়ফুঁক ইসলামে জায়েয। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম দুষ্ট জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে এবং জাদুর প্রভাব দূর করতে ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নিয়েছেন *(মুসলিম, শরহ নববী ১৪/১৬৮; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৮/২৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি, যার প্রতিকারও দেননি' *(আবুদাঊদ হা/৩৮৫৫; মিশকাত হা/৪৫৩২; ছহীহুল জামে' হা/২৯৩০)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : আমাদের দেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন নটরডেম, হলিক্রস, সেন্ট জোসেফ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাগুলোর সিলেবাস দেশের জেনারেল শিক্ষার সিলেবাসের মতোই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন করা যাবে কি?

-কায়ছার জামীল, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : প্রথমত মুসলিম শিক্ষার্থীদের মুসলিম স্কুলে ভর্তি করতে হবে। কারণ এটা তাদের আমল ও আক্বীদার জন্য নিরাপদ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/১৪১)*। দ্বিতীয়ত এলাকায় মুসলিম স্কুল না থাকলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে মিশনারী স্কুলে ভর্তি করা যেতে পারে। যেমন- (১) যদি দেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমই তাদের পাঠ্যপুস্তক হয় এবং তা পড়ানো হয় (২) শিক্ষার্থীকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বাধ্য করা না হয়, (৩) তার ঈমান ও ইসলামী পরিচয় যদি নিরাপদ থাকে, (৪) মুসলিম শিক্ষার্থী তার ফরয ইবাদত ও ইসলামী আদর্শ বজায় রাখতে পারে। তবে যদি সেখানে ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি, খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারে প্রভাবিত করা, ইসলামী বিধান পালনে বাধা দেওয়া বা ঈমানের জন্য ঝুঁকি থাকে, তাহ'লে সেখানে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : একটি জমি নিয়ে কোর্টে মামলা চলছে। এমতাবস্থায় উক্ত জমিতে স্থায়ীভাবে মসজিদ বানানো যাবে কি?

-মাসঊদ, বগুড়া।

উত্তর : স্থায়ীভাবে মসজিদ বানানো যাবে না। কারণ মামলা চলায় এর মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি। তবে সকলের সম্মতিক্রমে সাময়িকভাবে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। স্থায়ী মসজিদ বা ঈদগাহ বানানোর জন্য জমি ওয়াকফকৃত হওয়া যরূরী *(বুখারী হা/২৭৭৪; মুসলিম হা/৫২৪)*

PRESIDENT
HOMES LTD.
PG
PRESIDENT GROUP
Way to enjoy in touch...
find your
DREAM HOME
BASHUNDHARA
PROJECT NAME :
President Dokkhina
PROJECT LOCATION :
Plot-3260, Road-15, Block-M
Bashundhara R/A, Dhaka-1229
LAND ORIENTATION :
3 Katha & South Facing
BUILDING HEIGHTS :
G+06 (07 storied building)
FLAT SIZE :
1550 sft (single unit)
NUMBER OF UNITS :
06 Nos
JOLSHIRI
PROJECT NAME :
President Khonikaloy (Lake View)
PROJECT LOCATION :
Plot-018, Road-513, Sector-11
Jolshiri Abashon
LAND ORIENTATION :
5 Katha & South Facing
BUILDING HEIGHTS :
G+M+08 (09 storied building)
FLAT SIZE :
2850 sft (single unit)
NUMBER OF UNITS :
08 Nos
book now
LAND
WANTED
for joint venture development
AT ANY PRIME LOCATION
IN DHAKA CITY
JOLSHIRI
PROJECT NAME :
President Noor Ashiyana
PROJECT LOCATION :
Plot-043, Road-506, Sector-16
Jolshiri Abashon
LAND ORIENTATION :
5 Katha & East Facing
BUILDING HEIGHTS :
G+M+08 (09 storied building)
FLAT SIZE :
2850 sft (single unit)
NUMBER OF UNITS :
08 Nos
PROJECT NAME :
President Halim's Dream
PROJECT LOCATION :
Plot-065, Road-304, Sector-11
Jolshiri Abashon
LAND ORIENTATION :
5 Katha & South Facing
BUILDING HEIGHTS :
G+M+08 (09 storied building)
FLAT SIZE :
2850 sft (single unit)
NUMBER OF UNITS :
08 Nos
01711-722 301 | 01711-750 638
www.president-group.com | www.presidenthomes.net

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 29, Issue 11, August 2026

Bangladesh EYE HOSPITAL Rajshahi Ltd.
Eye Care, We Care

বাংলাদেশ আই হসপিটাল রাজশাহী লিমিটেড

চোখের যত্নে বিশ্বস্ত ঠিকানা

বাংলাদেশের স্বনামধন্য চক্ষু হাসপাতাল ‘বাংলাদেশ আই হসপিটাল’-এর নতুন শাখা এখন রাজশাহীতে

এখানে সকাল ৮-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখছেন প্রায় **২৫-৩০ জন অভিজ্ঞ ও দক্ষ চক্ষু বিশেষজ্ঞ**। চোখের সকল জটিল ও সাধারণ সমস্যার জন্য এখানে রয়েছে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ চক্ষু চিকিৎসা সেবা।

সেবাসমূহ

ছানি (ফ্যাকো) অপারেশন, গ্লুকোমা চিকিৎসা, রেটিনা ও ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, কর্নিয়া ও চোখের সংক্রমণ, শিশুদের চোখের রোগ ও স্কুইন্ট (ট্যারা), অকুলোপ্লাস্টিক (Oculoplastic) সেবা (চোখের পাতা, চোখের চারপাশ ও টিয়ার ডাক্ট), চশমা ও কনট্যাক্ট লেন্স এবং চোখের সকল আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে সর্বাধুনিক মেশিনারিজ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব পরিবেশ এবং সাশ্রয়ী খরচে মানসম্মত চিকিৎসা।

যোগাযোগ

আই টেন টাওয়ার, এয়ারপোর্ট রোড, আম চত্বর রাজশাহী
মোবাইল : ০৯৬৪৩১২৩১২৩

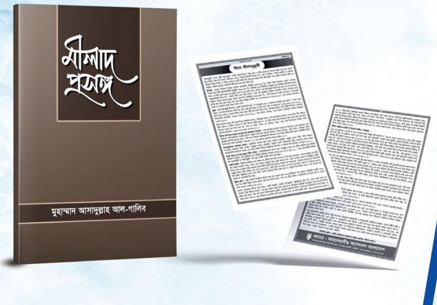

মীলাদ প্রসঙ্গ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রচলিত ‘মীলাদুন্নবী’ অনুষ্ঠান ধর্মের নামে সৃষ্ট একটি বিদ‘আতী রীতি মাত্র। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বইটি সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। সাথে এ সংক্রান্ত লিফলেটটিও পাঠ ও বিতরণ করতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনার প্রচেষ্টায় একজন ব্যক্তিও যদি সঠিক পথে ফিরে আসে সেটিই আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লাল উট কুরবানী করার চাইতে শ্রেষ্ঠতর হবে (*বুখারী হা/২৯৪২*)।

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০